“নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা”
সম্পর্কিত একটি গবেষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম. ফিল. ডিগ্রি

অর্জনের শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনায়

মোসাঃ সালমা খানম

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৮৩

শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-২০০৯

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জমাদানের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৬

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ গবেষণা কর্মে সংযোজিত তথ্য-উপাত্ত আমার জানামতে অন্য কোন গবেষণা কর্ম থেকে অনুকরণ করা হয়নি। গবেষণা কর্মটি মোসাঃ সালমা খাতুন আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন।

ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "*নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা*" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি মৌলিক গবেষণা, যা ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা, প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোন গবেষণা থেকে অনুকরণ করা হয়নি।

এই থিসিসে গবেষণালব্ধ তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়নি।

উপস্থাপনায়

মোসাঃ সালমা খানম

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৮৩

শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-২০০৯

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা" শিরোনামে গবেষণা কাজটি মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম. ফিল. থিসিস হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে, যিনি আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য দান করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা স্যারের কাছে যিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থিসিস নিয়ে কাজ করার অনুমতি ও সুযোগ দিয়েছেন এবং শত ব্যস্ততার মাঝে গবেষণার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, নির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করে আমাকে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার সাহস যুগিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ব্র্যাক লাইব্রেরি, উইমেন ফর উইমেন লাইব্রেরি, স্টেপস টু ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট লাইব্রেরি ও বিক্রয় কেন্দ্র, প্রশিকা লাইব্রেরি, গ্রামীণ ব্যাংক ও আশা পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ এবং অন্যান্য যারা আমাকে প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল, সাময়িকী ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যে সমস্ত বই, পুস্তক, জার্নাল ও গবেষণা প্রতিবেদন আমি গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি তার লেখক ও গবেষকদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ব্র্যাকের উপকারভোগী নারী ও কর্মীদের প্রতি যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ব্র্যাক হেড অফিসের ভিজিটর প্রোগ্রামের সিনিয়র ম্যানেজার ফরিদুজ্জামান রানা ভাই এবং গাজীপুর সদর উপজেলার ব্র্যাক অফিসের ম্যানেজার ত্রিলোচন দাদার কাছে যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া এই সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হত না।

এই গবেষণা প্রতিবেদনটির বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-কাজে বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের সহায়তা নেয়ায় বাংলা একাডেমীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অনুজ প্রতিম স্নেহভাজন রহমত উল্লাহ রফিকের কাছে যে, কম্পিউটার কম্পোজসহ তথ্য বিশ্লেষণে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরিবারের সকল সদস্যের নিকট। আমার পিতা-মাতার আশীর্বাদ, শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার স্বামীর পরোক্ষ সাহায্য, আমার শ্রদ্ধাভাজন ভাইয়া এম. এ. খালেকের সহযোগিতা সর্বোপরি আমার স্নেহভাজন সহোদর হাসান মেহেদীর অনুপ্রেরণায় আমি মুগ্ধ, আমি ঋণী। আমি ঋণী আমার দেবতুল্য তিনটি শিশু দীপ, ঐশিক ও ঋদ্ধির কাছে যারা সময় মত তাঁদের কাজটুকু করেছে এবং আমাকে অনবরত উৎসাহ প্রদান করেছে।

মুখবন্ধ

সভ্যতার বিকাশ এবং সভ্যতার ধারক-বাহক হিসেবে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা জোর কদমে এগিয়ে চললেও নারীর প্রাপ্য অধিকার, মর্যাদা এবং ক্ষমতা চিরকালই উপেক্ষিত। বাংলাদেশের মত একটি দেশ, যে দেশ অযুত-নিযুত সমস্যায় জর্জরিত, সে দেশের একজন নাগরিক হয়ে স্বভাবতই মনে কৌতূহল জাগে এদেশের নারীরা তার প্রাপ্য মর্যাদাটুকু লাভ করার সংগ্রামে কতখানি ঐক্যবদ্ধ? আর এই সংগ্রামে তাদের চলার পথকে এনজিওগুলো কতটুকু মসৃণ করতে পেরেছে? কারণ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এদেশে এনজিওর কার্যক্রম শুরু হয়। এনজিওগুলো ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র নারী গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে নারী যে এক টানে তার ভাগ্য পরিবর্তন করে ফেলবে তা কিন্তু নয়; বরং গবেষকের কাছে মনে হয়েছে ঋণ দেয়ার অর্থ এই যে, দরিদ্র নারীরও ঋণ পাবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার কাজে লাগিয়ে নারী তার ভাগ্যের উন্নয়ন করার জন্য যথেষ্ট যোগ্য ও উপযোগী। এই চিন্তা ভাবনা থেকেই এই অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু "নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা" শিরোনামে যে গবেষণা করা হয়েছে তাতে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার প্রচেষ্টা আছে। এ জন্য প্রাসঙ্গিক ভাবনা, বিষয়বস্তুর গভীরতা, মাঠ পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহসহ এনজিওর পরিচিতি, এনজিও কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিমালা সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। যা অভিসন্দর্ভটিকে ঋদ্ধ করেছে। আশা করা যায়, অধিকতর গবেষণার জন্য এ অভিসন্দর্ভটি ভবিষ্যতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের পরিচিতি

(List of Abbreviation)

AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
ASA	Association for Social Advancement
BNPS	Bangladesh Nari Progoti Sangha
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BWHC	Bangladesh Women Health Coalition
CARE	Cooperating American Relief for Every where
CEDAW	Convention on the Eliminations of all forms of Discrimination Against Women
CIDA	Canadian International Development Agency
CIRDAP	Center on Integrated Rural Development Asia and Pacific
FGD	Focus Group Discussion
FIVDB	Friends in Village Development Bangladesh
HIV	Human Immunodeficiency Virus
NGO	Non Government Organization
NUK	Nari Uddog Kendra
PROSHIKA	Proshikkhon Shikka Kaz
RDRS	Rangpur Dinanjpur Rural Service
UNDP	United Nations Development Program

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
থিসিসের শিরোনাম		I
প্রত্যয়ন পত্র		II
ঘোষণাপত্র		III
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		IV-V
মুখবন্ধ		VI
প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের পরিচিতি		VII
সূচিপত্র		VIII-X
সারণি তালিকা		XI-XII
লেখচিত্র তালিকা		XIII-XIV
মানচিত্র	গাজীপুর সদর	XV

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১	বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান	৪
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৬
১.৩	গবেষণা পদ্ধতি	৬
	১.৩.১ এলাকা নির্বাচন	৭
	১.৩.২ নমুনা নির্বাচন	৭
	১.৩.৩ প্রশ্নপত্র তৈরি ও প্রাক-পরীক্ষণ	৭
	১.৩.৪ মাঠ পর্যায়ের কাজ ও তথ্য সংগ্রহ	৮
	১.৩.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	৮-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা ও বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা

২.১	প্রাসঙ্গিক রচনাবলির পর্যালোচনা (Literature review)	১০-১৯
২.২	গবেষণার যৌক্তিকতা	১৯-২০

তৃতীয় অধ্যায়

বিবর্তনের ধারায় এনজিও

৩.১	এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বিবর্তন ও পটভূমি	২১
৩.২	বাংলাদেশে এনজিও	২২-২৬
৩.৩	এনজিও'র প্রয়োজনীয়তা	২৬-৩২

চতুর্থ অধ্যায়

এনজিওদের নারী উন্নয়ন কর্মসূচি

৪.১	গবেষণাধীন এনজিওসমূহ	৩৩-৩৮
৪.২	উপকারভোগীদের জন্য এনজিওর উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৩-৮০
৪.৩	এনজিও কার্যক্রমের সম্ভাবনা	৮০-৮৪
৪.৪	এনজিও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা	৮৫-৮৯
	উপসংহার	৮৯-৯০

পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ের ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৫.	উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৯১-১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা সার-সংক্ষেপ ও উপসংহার

৬.১	গবেষণার সারসংক্ষেপ	১৪১-১৪৮
৬.২	উপসংহার	১৪৮-১৪৯
গ্রন্থ পঞ্জি		১৫০-১৫৬
পরিশিষ্ট-১	সাক্ষাৎকার অনুসূচি-ক এনজিও সুবিধাভোগী	১৫৭-১৬৫
পরিশিষ্ট-২	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	১৬৬-১৭৩
পরিশিষ্ট-৩	এবস্ট্রাক্ট	

সারণি তালিকা

সারণি নং বিবরণ পৃষ্ঠা নম্বরঃ ৯১-১৩৭

সারণি ৫.১ উপকারভোগীর বয়স

সারণি ৫.২ উপকারভোগীদের পরিবারের ধরন

সারণি ৫.৩ উপকারভোগীদের শিক্ষাস্তর

সারণি ৫.৪ উপকারভোগীদের বৈবাহিক অবস্থা

সারণি ৫.৫ উপকারভোগীদের পেশা

সারণি ৫.৬ উপকারভোগীদের কৃষি জমির পরিমাণ

সারণি ৫.৭ উপকারভোগীদের গৃহাঙ্গনের জমি

সারণি ৫.৮ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ

সারণি ৫.৯ উপকারভোগীদের আয়ের পরিবর্তন

সারণি ৫.১০ উপকারভোগীদের আয় বাড়ার কারণ সমূহ (একাধিক উত্তর)

সারণি ৫.১১ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততার সময়কাল

সারণি ৫.১২ সদস্য হওয়ার পর কর্মসংস্থানে পরিবর্তন

সারণি ৫.১৩ পরিবারের গড় মাসিক আয়

সারণি ৫.১৪ পরিবারের গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি

সারণি ৫.১৫ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধা (একাধিক উত্তর)

সারণি ৫.১৬ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন

সারণি ৫.১৭ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের ধরন

সারণি ৫.১৮ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ (একাধিক উত্তর)

সারণি ৫.১৯ প্রশিক্ষণের প্রভাব (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.২০ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর উপকারভোগী ও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা
সারণি ৫.২১ নিরাপদ খাবার পানি গ্রহণের অবস্থা
সারণি ৫.২২ নিরাপদ পানি ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.২৩ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা

সারণি ৫.২৪ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.২৫ চিকিৎসায় গুরুত্ব প্রদান
সারণি ৫.২৬ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা
সারণি ৫.২৭ ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.২৮ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার
সারণি ৫.২৯ দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৩০ সদস্য হওয়ার ফলে বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা
সারণি ৫.৩১ সদস্য হওয়ার ফলে বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৩২ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা
সারণি ৫.৩৩ পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৩৪ সন্তান ধারণে প্রভাব (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৩৫ আয়ের টাকা কার হাত দিয়ে খরচ হয় (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৩৬ সদস্য হওয়ার পর পরিবারে কাজের চাপের অবস্থা
সারণি ৫.৩৭ পরিবারে কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৩৮ নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি
সারণি ৫.৩৯ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ক্ষেত্র (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৪০ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়া চিত্র (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৪১ ঘরে সময় না দিয়ে বাইরে দিলে উপার্জন করতে পারা যেত কি না
সারণি ৫.৪২ ঘরে সময় না দিয়ে বাইরে দিলে উপার্জন করার ক্ষেত্র
সারণি ৫.৪৩ ঘরে সময় না দিয়ে বাইরে দিলে উপার্জন করতে না পারার কারণ
সারণি ৫.৪৪ নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য এনজিওদের করণীয় (একাধিক উত্তর)
সারণি ৫.৪৫ পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সুপারিশ

লেখচিত্র তালিকা

চিত্র নং **বিবরণ** **পৃষ্ঠা নম্বরঃ ৯২-১৩৬**

লেখচিত্র- নং: ১ উপকারভোগীর বয়স

লেখচিত্র- নং: ২ উপকারভোগীদের পরিবারের ধরন

লেখচিত্র- নং: ৩ উপকারভোগীদের শিক্ষাস্তর

লেখচিত্র- নং: ৪ উপকারভোগীদের পেশা

লেখচিত্র- নং: ৫ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ

লেখচিত্র- নং: ৬ উপকারভোগীদের আয়ের পরিবর্তন

লেখচিত্র- নং: ৭ উপকারভোগীদের আয় বাড়ার কারণ সমূহ

লেখচিত্র- নং: ৮ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততার সময়কাল

লেখচিত্র- নং: ৯ সদস্য হওয়ার পর কর্মসংস্থানে পরিবর্তন

লেখচিত্র- নং: ১০ পরিবারের গড় মাসিক আয়

লেখচিত্র- নং: ১১ পরিবারের গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি

লেখচিত্র- নং: ১২ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধা

লেখচিত্র- নং: ১৩ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন

লেখচিত্র- নং: ১৪ আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের ধরন

লেখচিত্র- নং: ১৫ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ

লেখচিত্র- নং: ১৬ উপকারভোগী ও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা

লেখচিত্র- নং: ১৭ নিরাপদ খাবার পানি গ্রহণের অবস্থা

লেখচিত্র- নং: ১৮ নিরাপদ পানি ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ

লেখচিত্র- নং: ১৯ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা

লেখচিত্র- নং: ২০ চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ

লেখচিত্র- নং: ২১ চিকিৎসায় গুরুত্ব প্রদান

লেখচিত্র- নং: ২২ ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা

লেখচিত্র- নং: ২৩ ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ

লেখচিত্র- নং: ২৪ দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার
লেখচিত্র- নং: ২৫ সদস্য হওয়ার ফলে বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা
লেখচিত্র- নং: ২৬ বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধির কারণ
লেখচিত্র- নং: ২৭ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা
লেখচিত্র- নং: ২৮ পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ
লেখচিত্র- নং: ২৯ সন্তান ধারণে প্রভাব
লেখচিত্র- নং: ৩০ আয়ের টাকা কার হাত দিয়ে খরচ হয়
লেখচিত্র- নং: ৩১ সদস্য হওয়ার পর পরিবারে কাজের চাপের অবস্থা
লেখচিত্র- নং: ৩২ নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি
লেখচিত্র- নং: ৩৩ বাইরে উপার্জন করতে পারা যেত কি না
লেখচিত্র- নং: ৩৪ বাইরে সময় দিলে উপার্জন করার ক্ষেত্র
লেখচিত্র- নং: ৩৫ বাইরে উপার্জন করতে না পারার কারণ
লেখচিত্র- নং: ৩৬ নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য এনজিওদের করণীয় %

মানচিত্রঃ গাজীপুর সদর

“নারীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভুমিকা”ঃ

সার সংক্ষেপ (এবস্ট্রাক্ট)

বাংলাদেশের নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কেমন তা দেখার জন্য আমরা এ গবেষণা কাজটি করেছি। গবেষণার শুরুতেই আমরা নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি আমরা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ তথা সংবিধানে নারী এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বিষয়ে সাধারণ আলোচনা করেছি।

আমরা মূলত নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকাকে দেখেছি তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রথমত: বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও সমূহ ও তাদের নারী-উন্নয়ন কর্মকৌশল সম্পর্কে জানা, দ্বিতীয়ত: মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নারীদের উপর এনজিও কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে জানা; এবং তৃতীয়ত: নারীর পুনঃউৎপাদনশীল ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে কি না তা দেখা। এক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করেছি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা ‘বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি’র (ব্র্যাক) ভূমিকা দেখার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা গাজীপুর সদর উপজেলাকে নির্বাচন করে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে ১০০ জন উপকারভোগী নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা দেখার জন্য আমরা মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, প্রতিবেদন থেকে এনজিওর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, নীতি ইত্যাদি তুলে ধরেছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করেছি। এছাড়া বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আমরা পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি।

এনজিওর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আমরা দেখেছি বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকেই কিছু এনজিও কার্যক্রম শুরু করে। আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে পাঁচ হাজার গ্রামে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় এনজিও, স্থানীয় এনজিও, সেবা প্রদানকারী এনজিও বাংলাদেশে কাজ করছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নারী উন্নয়নে এনজিওদের নীতি, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি, পরিকল্পনা, কৌশল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি এনজিওদের মূল কর্মকান্ডে এখন নারীর উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। এ অধ্যায়ে আমরা এনজিও সুবিধাভোগীদের জন্য এনজিওদের বিভিন্ন নীতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। এনজিও কার্যক্রমের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এনজিও সুবিধাভোগী বা উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করেছি। মাঠ পর্যায়ে এনজিওদের কার্যক্রমের বিস্তৃতি, প্রভাব, সীমাবদ্ধতা, সুপারিশ ইত্যাদি উঠে এসেছে সুবিধাভোগীদের মতামত থেকে।

আমরা দেখেছি উপকারভোগীদের মধ্যে দরিদ্র নারীর সংখ্যাই বেশি। সদস্যদের তিনভাগের মধ্যে দু'ভাগেরও বেশি সদস্য নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত। সুবিধাভোগী নারীদের মধ্যে সব বয়সের নারীই রয়েছে। তবে অধিকাংশ সদস্যই মধ্য বয়সের। দেখা যায় বিবাহিত নারীদেরকেই ঋণ দেয়া হয় অর্থাৎ যাদের স্বামী বা সন্তান বা অন্য কোন পুরুষ সদস্য রয়েছে তাদেরকে ঋণ দেয়া হয়। তাছাড়া উপকারভোগীদের মধ্যে গৃহিণীর সংখ্যা বেশি। তবে তারা গৃহিণী হলেও ঘরে বসেই পরিবারের উন্নয়নে কাজ করছেন। উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রায় অর্ধেকের আয় গড়ে পাঁচ হাজারের নীচে। তবে সংস্থার সদস্য হওয়ার পর প্রত্যেক সদস্যেরই আয় কম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা দেখেছি উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। দেখা গেছে ৪ বছর থেকে তার উপরের সদস্য সংখ্যা ৫৯ শতাংশ। এ দীর্ঘ সময় ধরে সংস্থার সাথে জড়িত থাকার ফলে তারা নিজেদের উন্নয়ন করতে পেরেছে। তাছাড়া দেখা গেছে ৫৬ শতাংশ সদস্য ঋণ তৃতীয়বার পর্যন্ত ঋণ নিয়েছে। তবে তৃতীয়বারে এমন অনেকে ঋণ নিয়েছেন যারা প্রথম ও দ্বিতীয়বারে ঋণ নিয়ে ভালো করতে পেরেছেন। তাছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বারে ঋণ গ্রহীতাদের অনেকেই আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও উন্নতি করতে পেরেছে। আয়ের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যে দেখা গেছে সংস্থার সদস্য ৭২ শতাংশের আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদের আয় বেড়েছে তারা সংস্থা থেকে টাকা তুলে উৎপাদনমূখী কোন কাজে বিনিয়োগ করতে পেরেছেন। দেখা যাচ্ছে আয় বর্ধক কাজে ঋণের টাকা বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া তারা আয় বর্ধক কাজ যেমন, ব্যবসা করা, অন্যান্য কাজের প্রশিক্ষণ পেয়ে ভালোভাবে কাজ করা, প্রচেষ্টার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং ঋণ পরিশোধ করে আবার ঋণ এনে নতুন ভাবে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। অর্থাৎ ঋণ এনে যথাযথভাবে উৎপাদনমূখী খাতে

তারা কাজে লাগিয়েছে এবং নিজেদের পূর্বের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থার সদস্যদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থান হয়েছে সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছে।

আমরা দেখেছি, এনজিওগুলো চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা, মাতৃকল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা, দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি সুবিধা সমূহ দিয়ে থাকে। এনজিও প্রদত্ত এসব সুযোগ সুবিধা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এনজিওগুলো নারীদেরকে পরিবারের উন্নয়ন সহযোগী, অর্থ উপার্জনকারী, সচেতন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের মূল ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তৈরি করেছে। এনজিওদের কর্মসূচির প্রভাবে সদস্যরা আয় করতে পারছে, ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারছে, পরিবারকে স্বাবলম্বী করছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে সার্বিকভাবে সামাজিকভাবে প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এনজিওতে অংশগ্রহণ করার ফলে নারীদের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ প্রবণতা কতটা বেড়েছে। এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে নারীদের বাইরে বের হওয়ার হারও বেড়েছে। তারা এখন যেমন নিজেদের কাজে বাইরে যেতে পারে তেমনি সংগঠনের কাজে যোগ দেয়।

দেখা গেছে পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার বেড়েছে। এনজিও কার্যক্রমের প্রভাবে পরিবারে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় সন্তান গ্রহণে নারী পুরুষ উভয়ের সিদ্ধান্তের হার অনেক বেশি। পরিবারে নিজের আয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া শুধু ঋণ দিয়েই এনজিওরা দায়িত্ব শেষ করেনি, নারীর সার্বিক উন্নয়নে তারা অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। নারীদের সচেতন করতে তারা অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংস্থার কর্মীদের পরামর্শে পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যরা অনেকেই তাদের পরিবার ছোট রাখছে। সংস্থা উপকারভোগীদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

তবে এনজিওদের কর্মকান্ডে আমরা শত ভাগ সফলতা দেখতে পাইনি, কেননা নারীদের আয় বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধা দুর হওয়া, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিজের অধিকার সম্পর্কে নারীকে সচেতন করা, ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর কর্মসংস্থান ও পরিবারে নারীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

বিষয়ে কর্মীরা শত ভাগ সফলতা দাবি করতে পারেননি। এনজিওরা যেহেতু নারীদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে তাই তাদের স্বামীর বাধ্য হয় স্ত্রীদের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই ঐ ঋণ গ্রহণকারী নারী তার পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। নারীকে স্বাবলম্বী করার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এনজিওরা ঋণ প্রদান করা শুরু করেছিল তা অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। এনজিওরা ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করলেও সমাজ এখনও মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত হয়নি। এনজিওদের নিয়ম-কানুন মেনে টাকা প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক সময় মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে এই সুদের ঘানি টানতে গিয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে।

এছাড়া এনজিওদের সমন্বয়হীনতার কারণে একই স্থানে এক সাথে বিভিন্ন এনজিও একই উপকারভোগীদের নিয়ে কাজ করে। ফলে দেখা যায় উপকারভোগীরা একাধিক এনজিওর সাথে জড়িত হয়, ঋণ নেয়, দলীয় সদস্য হিসাবে নাম লেখায়। এতে দেখা যায় একাধিক এনজিও থেকে প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে অধিকাংশ সময় সঠিক পরিকল্পনা করে কাজে লাগাতে পারে না। অনেকে এক এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে অন্য এনজিওর ঋণ পরিশোধ করে আর বাকি টাকা খরচ করে ফেলে। এতে উপকারভোগীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। এছাড়া বিভিন্ন এনজিওর বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে জড়িত হতে গিয়ে তারা কোনো কাজই ঠিক মত শিখতে পারে না, ফলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এনজিওদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ খুব স্বল্পমেয়াদি হওয়ায় সুবিধাভোগীদের পক্ষে বিষয়গুলো পুরোপুরি বোঝা সহজ হয় না। ফলে এইসব কার্যক্রম সকল উপকারভোগীর জন্য খুব একটা লাভ বয়ে আনে না।

তবে সামগ্রিক পর্যালোচনায় আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওদের বর্তমান কার্যক্রমের যে বাস্তব অবস্থা আমরা দেখেছি তাতে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এনজিওর ভূমিকা অনেক ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ প্রতীয়মান হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা:

'বাংলাদেশ' নামক লাল সবুজ পতাকার অধিকারী ভূখন্ডটি এক রক্তস্নাত সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে জন্ম নিয়েছে ১৯৭১ সালে। সবে চল্লিশ পার হওয়া এই দেশটির জন্মের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসের পেছনে রয়েছে আরও সুদীর্ঘ সময়ের তিতিক্ষার ইতিহাস। হাজার বছরের সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ বাঙালি জাতি মূলত: একটি শংকর জাতি। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মিশ্রণে বিবর্তনের ধারায় আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কালক্রমে বঙ্গ থেকে বঙ্গাল বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত বেঙ্গল, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এই অভ্যুদয় মোটেও এত সহজ ছিল না। প্রাচীন আমলে বাংলা বিভক্ত ছিল সমতট, হরিকেল, বঙ্গ, রাঢ়, পুন্ড্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে।

নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদের মধ্যে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' ছিল মাত্র দুটি জনপদ। কিন্তু এ দুটি নাম থেকেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি।[১] মধ্যযুগে বাংলা সাড়ে পাঁচশো বছর ব্যাপী বহিরাগত মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়। যে সময়ে বলতে গেলে এ দেশের চিরায়ত সামন্ত সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থা অটুট ছিল। বাঙালির জীবন-যাপন ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত। গ্রামগুলো ছিল স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামবাসীর প্রয়োজন মেটানোর সব জিনিসপত্র গ্রামেই উৎপাদিত হত। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলো তাদের বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। প্রধানত তিনটি কারণে ব্রিটিশ শাসনামলে গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

প্রথমত: ঔপনিবেশিক শাসকেরা স্থানীয় জনগণের প্রধান খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্তে ব্রিটিশদের স্বার্থে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে স্থানীয় কৃষকদের বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয়ত: শিল্প বিপ□ব এবং কল-কারখানার স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত জিনিসপত্রের সঙ্গে স্থানীয় কুটির শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না বলে ওইসব কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং

[১] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ: ৯-১০

তৃতীয়ত: কর সংগ্রহের ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের জন্য যতদূর সম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ। এর মধ্যে প্রথম দুটো কারণের মধ্যে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ব্রিটিশদের সঙ্গে এদেশের স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির সম্পৃক্তকরণ। এ সকল প্রক্রিয়ার ফলে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমশ দারিদ্র্যের পদধ্বনি প্রকট হয়ে ওঠে।[২] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে চিরায়ত প্রায় স্বনির্ভর ও স্বনিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সমাজ ভেঙে পড়ছিল। তবে ব্রিটিশ আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অভূতপূর্ব প্রসার। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি, চাকুরি ইত্যাদির প্রসার ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, ১৮৬১ সাল থেকে শুরু করে গৃহীত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, যার মাধ্যমে ভারতবর্ষ শাসিত হতো এবং যাকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক আমলে এদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা উন্মেষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এদেশে আমলা শ্রেণি ও জাতীয় বুর্জোয়া পুঁজির বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে অবাঙালিরা। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রেও তাদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ফলে এর রাষ্ট্রযন্ত্রও বুর্জোয়া শ্রেণির রক্ষক হিসেবে কাজ করছিল এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে সম্ভাব্য সবরকমের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এই বুর্জোয়া শ্রেণির এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়াকার্যের মূলকেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, জাতিগত দিক থেকে তারা ছিল অবাঙালি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা এ অঞ্চলের প্রতি একটি ঔপনিবেশিকসুলভ মনোভাব গড়ে তুলেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে শোষিত হচ্ছিল।[৩]

এই শোষণ ছিল প্রধানত: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। বাংলার জনগণের বিপুল ত্যাগ, সমর্থন ও ভোট ব্যতীত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যেখানে প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই রাষ্ট্রে তাদের ভাষা-সংস্কৃতির উপর আঘাত, জাতি-নিপীড়ন, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্যের বাজার হিসেবে গণ্য, আঞ্চলিক বৈষম্য ইত্যাদি বাঙালিদের বিক্ষুব্ধ করে। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির প্রথম বিদ্রোহ দেখা যায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে জীবন দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি

---

[২] সেলিম জাহান, *অর্থনীতি ভাবনা ও ২০০০ সালের বাংলাদেশ*, ঢাকা: চেতনা প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ: ১৩

[৩] পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩-১৪

করে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবেলার জন্য গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। ফ্রন্টের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের সামনে ২১ দফা পেশ করা হয়, যা ছিল বাঙালির ইচ্ছার প্রতিফলন।[৪]

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পাকিস্তানি শাসন পর্বে ভাষার প্রশ্ন ব্যতীত আরও যেসব বিষয় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো ছিল সেনা-আমলা শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম, সেক্যুলার রাজনীতির প্রসার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ, শোষণ-বঞ্চনামুক্ত দেশ, সর্বোপরি স্বাধীনতা অর্জন।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর সামনে বাঙালির বাঁচার দাবি 'ছয়দফা' কর্মসূচি তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি ছাত্র সংগ্রামের ১১ দফা কর্মসূচি যুক্ত হলে মুক্তিসংগ্রামে মাত্রাগত নতুন গতির সঞ্চার হয়। আন্দোলন দমনে সামরিক জান্তা আইয়ুব খান 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আশ্রয় গ্রহণ করলে পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে ঘটে গণঅভ্যুত্থান। আইয়ুব শাহীর পতন ঘটে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৭০ এর আগে দেশে কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সময় ক্ষেপণ করে বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে নীল নকশা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে থাকে। ফলত: পরিস্থিতি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের কিছু পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। নয় মাস ব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের জীবন, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্টের বিনিময়ে হানাদার মুক্ত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫]

---

[৪] সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ: ৫৩-৫৪

[৫] হারুন-অর রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন*, ঢাকা: নিউ এড পাবলিকেশন্স, ২০০১, ১৯-২৪; Archer K. Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd., 2002, p.113-115; Nurul Islam, Making of a Nation Bangladesh, Dhaka: University Press Ltd., 2003, p.3

বাংলাদেশের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই এদেশে এনজিওর সূচনা। প্রথম দিকে এনজিওর কর্মসূচি ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে, পরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়। বর্তমানে জোর দেয়া হয়ে থাকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এমন কর্মসূচির ওপর।[৬]

এনজিওদের কাজে সবচেয়ে গুরুত্ব পায় প্রান্তিক ও দরিদ্র নারী সমাজ। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কাজ শুরু করলেও ক্রমেই তারা উপলব্ধি করে শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে একজন দরিদ্র নারীর পক্ষে আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নারী ঘরে-বাইরে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজস্ব আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা, সন্তান ও পারিবারিক বিষয়ে মতামতসহ সার্বিক বিষয়ে আত্ম উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নিজের গৌরব অবস্থান-নিশ্চিত করতে পারে।

এই চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষিতেই নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে যুক্ত হয়ে নারীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে।

১.১ বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ২৮.২ এ নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে।[৭] যেহেতু জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা বিশ্বাস করে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নারী-পুরুষের সমতা আনতে না পারলে বিশ্বকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাংকসহ সকল দাতা সংস্থা ও দেশ নারীর অবস্থার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে দেশে নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের তাগিদ দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকসহ বিভিন্ন দিকে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে।

মানব জাতির উদ্ভবের কাল থেকেই নারীরা সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর ভূমিকা খুবই গৌণ, এমনকি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।[৮]

---

[৬] কামাল সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ: ৮৩

[৭] আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৯৯, পৃ: ১৪

[৮] শাহীন রহমান, *জেন্ডার প্রসঙ্গ*, ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮, পৃ: ৬২-৬৩

নারীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, মোট শ্রমশক্তির ৪৮ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ত্রিশ ভাগ। পৃথিবীর মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ নারীরা সম্পাদন করে এবং পুরুষের চেয়ে প্রায় পনেরো গুণ সাংসারিক বোঝা বহন করে। কিন্তু নারীরা মোট সম্পদের একশো ভাগের মাত্র এক ভাগের মালিক এবং মোট আয়ের দশ ভাগের একভাগ তারা লাভ করে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর ১৫৫ কোটি চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৭০ ভাগ এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ নারী। স্কুলে না যাওয়া শিশুদের মধ্যে আট কোটি কন্যা শিশু। পৃথিবীতে স্কুলে পঠনযোগ্য ৬৫ মিলিয়ন কন্যা শিশু স্কুল থেকে বাইরে রয়েছে। সত্তরটি দেশে কন্যা শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৮৫ শতাংশের নীচে। ৭৬ শতাংশ কন্যা শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে, যেখানে ছেলে শিশুর সংখ্যা ৮৫ শতাংশ।[৯]

বিশ্বে নারীর মর্যাদার তথ্যটি বিশে- ষণ করলে যে চিত্র পাওয়া যায়, তা আরও হতাশাব্যঞ্জক। পৃথিবীর মোট ভোটারের অর্ধেক নারী হলেও সারা বিশ্বে জাতীয় সংসদে মাত্র দশ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব করছে। মাত্র ছয় শতাংশ নারী মন্ত্রী পর্যায়ে আছেন এবং এখন পর্যন্ত ৬২টি দেশে কোন নারী মন্ত্রী পদমর্যাদায় নেই। বিশ্বের ইতিহাসে এ যাবৎকালে মাত্র ২৪ জন নারী রাষ্ট্রপ্রধান হতে পেরেছেন। এমনকি, দুঃখজনক হলেও সত্য যে জাতিসংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ১৮৫ জন কূটনীতিকের মধ্যে কেবল সাতজন নারী। জাতিসংঘে আজ পর্যন্ত কোন নারী মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হননি। সারা পৃথিবীতেই যখন নারীর এহেন চরম দুর্দশা বিরাজমান; নারী যেখানে সবদিক থেকেই অবহেলিত, বঞ্চিত; যেখানে পরিবার তাকে বঞ্চনা করে, সমাজ তাকে প্রতারণা করে এবং রাষ্ট্র তার অধিকার দিতে কার্পণ্যতা দেখায়- সেখানে বাংলাদেশের নারীর আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কতটুকু ইতিবাচক অথবা ইতিবাচক হলেও কতটুকু ফলপ্রসূ তা অবশ্যই গবেষণার দাবি রাখে।

একটা বিষয় প্রমাণিত সত্য যে, উন্নয়নের মূল ধারায় সরাসরি নারীকে সংযুক্ত করা না গেলে, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা না গেলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। অতীতের উন্নয়ন দর্শনের মত নারীদের অদৃশ্য বা পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে নয় বরং উন্নয়নের দৃশ্যমান সক্রিয় চলকরূপে বিবেচনা করে কাজ করলেই নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

---

[৯] UNICEF, *UNICEF at a Glance*, New York: January 2004, p.2-7

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রতিটি গবেষণাই কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হয়। নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা ও সম্পৃক্ততা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ টাকা এনজিও সমূহ এদেশের গ্রামীণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র দুস্থ নারীর উন্নয়নের জন্য, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রকৃত উন্নয়নের জন্য খরচ করে যাচ্ছে, কিন্তু নারী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তাই বর্তমান গবেষণার আরও যেসব বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে তা হল-

১. বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও সমূহ ও তাদের নারী-উন্নয়ন কর্মকৌশল এবং নারী উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা;
২. তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর মঙ্গল কামনার্থে যে সকল এনজিও কাজ করছে বাস্তবিক অর্থে তাদের অবদান কতটুকু তা জানা।
৩. মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নারীদের উপর এনজিও কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে জানা;
৪. নারীর পুনঃউৎপাদনশীল ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে কি না তা দেখা;

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি নারী-পুরুষ উপকারভোগীদের ওপর এনজিও'র কার্যক্রমের প্রভাবের একটি বিশে- ষণ। গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষকের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সময় ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি এনজিওকে নির্বাচন করা হয়েছে। এনজিওটি হল নারী-পুরুষ উপকারভোগী সংশি- ষ্ট জাতীয় এনজিও 'বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য 'নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা' শিরোনামে গাজীপুর সদর উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ উপজেলায় কার্যরত একাধিক এনজিওর মধ্যে গবেষণার জন্য বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাককে বেছে নেয়া হয়েছে। নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য গাজীপুর সদর উপজেলায় ব্র্যাকের নারী উপকারভোগীদের মধ্য থেকে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল এনজিওর কার্যক্রম উপকারভোগীদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর অধিকারের প্রতিষ্ঠায় কতটা ও কি ধরনের ভূমিকা রাখছে তা জানা। এখানে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলত; সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ফোকাস

গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমেও তথ্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া গবেষক হিসেবে তাঁদের আচার-আচরণ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন যাপন পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৩.১ এলাকা নির্বাচন

গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্র্যাকের কার্যক্রম এলাকা গাজীপুর সদর উপজেলাকে গবেষণা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। এলাকা নির্বাচন করার সময় যে দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে তা হল-

ক. ১৯৯৬ সাল থেকে গাজীপুর সদর উপজেলায় ব্র্যাক তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রম সফলতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছে।

খ. গবেষণা এলাকা গাজীপুর সদর উপজেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল।

১.৩.২ নমুনা নির্বাচন

গাজীপুর সদর উপজেলায় ব্র্যাক এর কর্ম এলাকা থেকে ১০টি সমিতি থেকে ১০ জন করে মোট ১০০ জনকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিটি সমিতি/শাখা থেকে ১০ জন করে নারী উপকারভোগীকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৩.৩ প্রশ্নপত্র তৈরি ও প্রাক-পরীক্ষণ

উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি সাক্ষাৎকার অনুসূচি তৈরি করা হয়েছে যাতে করে গভীর (Intensive) এবং সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এ সাক্ষাৎকার অনুসূচির কয়েকটি অংশ ছিল নিম্নরূপ:

ক. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা চিহ্নিতকরণ;

খ. কর্মসূচি বা কার্যক্রমের প্রতি সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর দৃষ্টিভঙ্গি;

গ. কর্মসূচির ফলে নিজেদের আত্মবিশ্বাস তৈরি/বৃদ্ধি;

ঘ. পরিবারে অবস্থান ও অবস্থানের পরিবর্তন;

ঙ. কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অসুবিধাসমূহ।

সাক্ষাৎকার অনুসূচিতে দুই ধরনের প্রশ্ন ছিল। কিছু প্রশ্ন কাঠামোবদ্ধ এবং কিছু প্রশ্ন ছিল খোলা। এই সাক্ষাৎকার অনুসূচি তৈরির পর প্রাক-পরীক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকার ১০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন উপকারভোগীর প্রাক-পরীক্ষণ এর ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার অনুসূচিতে সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১.৩.৪ মাঠ পর্যায়ের কাজ ও তথ্য সংগ্রহ

মূলত সামাজিক গবেষণা অনেকখানি নির্ভর করে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের উপর। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নিকট থেকে পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের আবাস, কর্মস্থল, সাপ্তাহিক সভাস্থল, অন্যান্য সভা ইত্যাদি স্থানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষক ও পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া অংশগ্রহণকারী এবং কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্য ভুলে যাবার আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সহায়ক (Secondary) তথ্যের জন্য ব্র্যাক এর বিভিন্ন দাপ্তরিক রেকর্ডের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থার বিভিন্ন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, অন্যান্য প্রতিবেদন, জার্নাল, সংবাদ বুলেটিন ইত্যাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে। এর বাইরে এলাকা বিষয়ক অন্যান্য তথ্য যেমন মানচিত্র, অন্যান্য পরিসংখ্যানিক তথ্য ইত্যাদির জন্য ইউনিয়ন ও পৌরসভার সাহায্য নেয়া হয়েছে। গবেষণায় মূলত দুই ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ ক) সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ, খ) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা।

১.৩.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশে-ষণ ও উপস্থাপন

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর তথ্য চূড়ান্তভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং সম্পাদনা করা হয়েছে। কাঠামোবদ্ধ এবং খোলা প্রশ্নের উত্তরসমূহকে সাবধানতার সাথে ‘কোড’ করা হয়েছে। তথ্যকে কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণ ও পরিসংখ্যানিক হিসাব করা হয়েছে। তথ্যকে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য

ও অনুমান (Assupmtion)এর আলোকে বিশে-ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য এবং চলকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য তথ্যকে টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় একটি গবেষণার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যকে সফলভাবে অর্জনের জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজগুলো করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা ও বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা

পৃথিবীতে নিত্য নতুন বিষয় জানা এবং উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, চিকিৎসাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য মানুষ সদা সচেষ্ট। "নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা" শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা বা প্রভাব অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য সংশি- ষ্ট গবেষণা ও গ্রন্থ পর্যালোচনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত পূর্বের গবেষণা প্রবন্ধ ও সাহিত্য অত্যন্ত সহায়ক।

বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকেই সাংবিধানিকভাবে নারী অধিকার স্বীকৃত হলেও সমাজ ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী তার যথাযথ মর্যাদা পায়নি। নারীর আর্থ-সামাজিক অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও তা এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসেনি। তবে বাংলাদেশের নারীরা সর্বক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অধিকার আদায়ে এখন অনেক বেশি তৎপর। এর পেছনে শিক্ষা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অন্যতম উপাদান। আর নারীর আর্থ-সামাজিক এ পরিবর্তনের পেছনে এনজিওর অবদানও কম নয়। নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলা, পরিবার ও সমাজে তাঁকে মর্যাদাবান করে তোলা, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় উৎসাহিত করার পেছনে বিভিন্ন এনজিও উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। এনজিওদের এ ধরনের পদক্ষেপ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নিতে নারী উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা ও নারীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্ক বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর পর্যালোচনা (Literature review)

বর্তমান গবেষণা কাজটি পরিচালনায় নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও এ অবস্থা থেকে উত্তরণে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু গবেষণা সাহিত্য ও প্রবন্ধ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারী ইস্যুভিত্তিক লেখালেখি ও গবেষণা পূর্বেও হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে; নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। সংশি-ষ্ট ক্ষেত্রের আওতায় ইতিপূর্বে যেসব গবেষণা ও গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য থেকে কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

প্রতিমা পাল মজুমদার, *শ্রমজীবী মহিলাদের দারিদ্র্যের বিভিন্ন মাত্রা*, ১৯৯৭ শীর্ষক গবেষণায় ঢাকা শহরের শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত বিশেষ করে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারীদের দারিদ্র্য অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, শিল্প ক্ষেত্রে নারীদের গড় আয় ১১৯২ টাকা। কাজে যোগদানের পূর্বে শতকরা ৭৪ জনের কোন রকম আয় ছিল না। কারখানার নিরাপত্তার প্রশ্নে ৩৫ শতাংশ নারী শ্রমিক উল্লেখ করেন পুরুষ সহকর্মীরা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং ৬ শতাংশ নারী উল্লেখ করেন, সুপারভাইজাররা তাদের মারধর করেন। শতকরা ১৯ জন নারী শ্রমিক মজুরি পেয়ে একক সিদ্ধান্তে বাজারে যেতে পারেন।

Md. Habibur Rahman তাঁর *Participation of Women in Rural Development: An Experience of Comprehensive Village Development Programme,* 1996 শীর্ষক গবেষণায় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নারীদের অংশগ্রহণের হার কতখানি তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে নারীর অংশগ্রহণ, পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং মূলধন গঠনে নারীর ভূমিকা সন্তোষজনক বলে দেখা যায় তার গবেষণায়। প্রকল্পের সাথে জড়িত নারীরা বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মসূচির সাথে জড়িত এবং পরিবারের জন্য বাড়তি আয় করছে।

Shahana Bilkis তাঁর *Women Education, Employment and Empowerment: Analysis of Interrelationship,* 2004 শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন, গত দুই দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার হার বেড়েছে, বিশেষ করে নারীদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। ক্ষমতায়নের জন্য নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ কতটা জরুরি- এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ অনেকটাই ভূমিকা রাখে।

Md. Noor Hossain এর *The Role of Forestry in Poverty Alleviation of Rural Women,* 2004 শীর্ষক গবেষণার উদ্দেশ্য নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে বনায়নের প্রভাব মূল্যায়ন করা। বিভিন্ন সংগঠন নারীকে বনায়নের সাথে যুক্ত করছে। ব্র্যাক, আশা এবং উবিনিগ এর সাভার ও টাঙ্গাইল

অঞ্চলের বনায়নের সাথে জড়িত দরিদ্র নারীদের উপর এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এর ফলে নারীর শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা হয়েছে। বনায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়, যেমন- মাটি, জমি, চারা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করেছে মোট ৯২.৫ শতাংশ নারী।

Bushra Hasina তাঁর *Empowering Urban Poor Women: The Role of Shakti Foundation,* 2005 শীর্ষক গবেষণায় শক্তি ফাউন্ডেশন নামক এনজিওর সাথে যুক্ত নারীদের ক্ষমতায়ন চিত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। এতে দেখা গেছে, এই এনজিওর সদস্যদের অধিকাংশই ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগের ব্যাপারে তাদের স্বামীদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্যের গতিশীলতা বেড়েছে। সদস্যরা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, সন্তান ধারণ, সন্তানের শিক্ষা, সংসারের খরচ, উপকরণ কেনা প্রভৃতি সব ব্যাপারে স্বামীর সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এই এনজিওর সদস্যরা পূর্বের তুলনায় ক্ষমতায়িত হয়েছে।

Firoz Mahboob Kamal তাঁর *Impact of Credit-Plus Paradigm of Development of Gender Inequality, Women's Empowerment and Reproductive Behaviour in Rural Bangladesh,* 1998 শীর্ষক গবেষণাটিতে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে জেন্ডার-এর প্রভাব পরীক্ষা করে দেখান যে, পরিবারে জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আচরণের পরিবর্তন হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ন দিন দিন বাড়ছে। ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচি নারীদের আয় বর্ধক কাজে জড়িত করছে এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করছে। ব্র্যাকের কার্যক্রম নারীদের প্রজনন আচরণ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পরিবার ছোট রাখা, বিয়ের বয়স বৃদ্ধি, পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখছে।

Farzan D. Amin ও Abdullahhel Hadi- এর *Microcradit Programs, Women Empowerment and Change in Nuptiality in Bangladesh Villages,* 1998 শীর্ষক গবেষণায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি চর্চার ক্ষেত্রে কতটা পরিবর্তন এসেছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। সদ্য বিবাহিত নারীদের মায়েদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে দেখা যায়, এসব নারীরা ঋণ কার্যক্রমে জড়িত হয়ে তাদের জীবনযাত্রার

পরিবর্তনের পাশাপাশি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। বাল্যবিবাহের মত সনাতনী চর্চাগুলো ধীরে ধীরে কমেছে।

Shamiha Huda এর ***Womens Control Over Productive Assests: Role of Credit based Development Intervention,* 1998** শীর্ষক গবেষণাটি চাঁদপুরের মতলব থানার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর পরিচালিত হয়েছে। ব্র্যাক এবং আইসিডিডিআর, বি এর যৌথ প্রকল্প এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রকল্প এবং প্রকল্পের বাইরে উভয় ধরনের উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গেছে নারীরা তাদের ছোট ছোট সম্পদ যেমন- গহনা বা ঘরের জিনিসপত্রের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে প্রকল্প বহির্ভূত উত্তরদাতাদের তুলনায় প্রকল্প ভুক্ত উত্তরদাতাদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বেশি বলে গবেষণায় দেখা যায়।

Kaosar Afsana-এর ***Women Program Organizar's Problems in BRAC: A Critical Assessment,* 1994** শীর্ষক গবেষণাটিতে ব্র্যাকের নারী কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নারী কর্মসূচি সংগঠকগণ অতিমাত্রায় কাজের চাপে থাকেন, তারা পরিবারে সময় দিতে পারেন না। বিশেষ করে গর্ভকালীন সময়ে এই সমস্যা বেশি হয়। এ সময় সাইকেল বা মোটর সাইকেলে চড়ে দীর্ঘসময় ফিল্ডে কাজ করেন কিন্তু প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে পারেন না। কাজের তুলনায় বেতন কম। সংগঠনে নারী কর্মসূচি সংগঠকের মতামতের মূল্য তেমন দেয়া হয় না। প্রমোশনের ক্ষেত্রে ম্যানেজারের সাথে যাদের সুসম্পর্ক আছে তারা প্রমোশন পান।

Asish Bose তাঁর **Women's Empowerment through Capacity Building, 2005** শীর্ষক গবেষণায় গণ স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়োগের পর তাদের ক্ষমতা উন্নয়নে সংস্থার ভূমিকা কতটুকু তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। ফলে দেখা যায়, ১০ শতাংশ কর্মী ১৫ বছর বয়সের আগেই কাজে যোগদান করেছেন। সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪৯.৮ শতাংশ কর্মী ১৬ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে কাজে যোগদান করেছেন। এসব কর্মীদের মধ্যে শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে পারে ২২ শতাংশ এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ে রয়েছে মাত্র ১.৯ শতাংশ।

Shafiqur Rahman & Lisa S. Singh কর্তৃক সিরডাপ সদস্যভুক্ত দেশের নারীদের উপর পরিচালিত ***Empowerment of Women in CIRDAP Member Countries:***

***Experience and Issues,* 2003** শীর্ষক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার ঘাটতি রয়েছে। তার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সম্পদে প্রবেশাধিকার, কর্মক্ষেত্র এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ফলাফলে দেখা যায়, ১৯৯৯ সালে দেশগুলোর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে নারী শ্রমশক্তির হার বাংলাদেশে ৭৮ শতাংশ, পাকিস্থানে ৬৬ শতাংশ, ফিলিপাইনে ২৭ শতাংশ। ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তি ৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ২৮ শতাংশ। জীবন প্রত্যাশা এবং নারীদের আয় সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে নারীদের জীবন প্রত্যাশা ৬০ বছর, পুরুষের ৬১ বছর, ভারতে জীবন প্রত্যাশা নারীদের ৬২ বছর, পুরুষের ৬৪ বছর। আবার আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পুরুষের আয় ১৮৬৬ মার্কিন ডলার, নারীদের ১০৭৬ মার্কিন ডলার। ভারতে পুরুষের আয় ৩২৩৬ মার্কিন ডলার, নারীদের ১১৯৫ মার্কিন ডলার।

Dilruba Ahmed এর ***Poverty Alleviation of the Hardcore Poor in Bangladesh: A Study on BRAC's Income Generation for Vulnerable Group Development Programme,* 1997** শীর্ষক গবেষণাটি মূলত দুস্থ নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক সহায়তা কর্মসূচির উপর একটি সমীক্ষা। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের পরিবারে নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। মোরগ-মুরগি পালন ছাড়াও সদস্যরা অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। গবাদি পশু পালন করে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তবে পরিবারগুলো নারী প্রধান হওয়ায় একমাত্র আয়ক্ষম নারীর পক্ষে পরিবারে দুরবস্থা সম্পূর্ণ ঘোচানো সম্ভব হয়নি। তাদের মাথাপিছু আয় গড়ে বছরে ৪৬৬০ টাকা মাত্র। অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকের বেশি (৫৮%) চরম দারিদ্র্যসীমার মধ্যে রয়েছে।

Momsen, Janet Henshall, *Women and Development in the third world,*1993 গবেষণায় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। গবেষণায় তিনটি মৌলিক বিষয় স্থান পেয়েছে। ১মতঃ সকল সমাজেই লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন রয়েছে। ২য়তঃ উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাদের ঘরে এবং ঘরের বাইরের উৎপাদন ও পুনঃ উৎপাদনমূলক কাজ বিবেচনা করতে হবে। ৩য়তঃ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রভাব বৈষম্যমূলক। তৃতীয় বিশ্ব বর্তমানে যেসব সংকটের সম্মুখীন যেমন-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং পরিবেশ বিষয়ে মহিলাদের উপর প্রভাব সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার সমাধানে মহিলাদের অখন্ড অবস্থান বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপসংহার টানা হয়েছে।

Showkat Ara Begum and Tapos Kumar Biswas, *Women's Empowerment and fertility,*1998 গবেষণায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের সাথে জন্মহার বৃদ্ধির বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। জন্মহার কমলে মহিলাদের সচলতা বাড়বে, সচলতা বাড়লে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের পথ ধরে উন্নয়ন ঘটবে। তবে পর্দা প্রথাকে নারীর সচলতার পথে বাধা হিসাবে দেখা হয়েছে। গবেষণায় ক্ষমতায়নের অন্যতম দুটো সূচক 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা'এবং 'সচলতা' এই দুটো সূচকের উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিছু ক্ষমতায়নের সূচক বহুমাত্রিক। গবেষণায় এটির অভাব রয়েছে।

Khaleda Salahuddin and Ishrat Shamim*, Rural women in poverty-NGO Interventions for Alleviation,* Women for women, 1996 শীর্ষক গবেষণায় গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের কঠোর সংগ্রাম এবং তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণে এনজিওদের মধ্যস্থতা স্থান পেয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এনজিওদের দ্বারা মহিলারা কিছুটা উপকৃত হলেও অনেক এলাকায় লিঙ্গগত ফারাক রয়ে গেছে। উপসংহারে ঋণ গ্রহীতারা তাদের টাকা কোথায় খাটায় তার মনিটরিং এর উপর গুরুত্বারোপ করে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

AKM Motinur Rahman *NGO and Development myth & Reality*, 2010 আশা, ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, এনজিওগুলো সদস্যদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এনজিওগুলো নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশের মহিলাদের নৈতিকতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে। গবেষক এনজিওর কর্মকান্ডকে দারিদ্র্যের পুঁজিবাদীকরন (Capitalization of poverty) বলে আখ্যায়িত করে সুপারিশ তুলে ধরেন।

Farzana Naz *Pathways to womens Empowerment in Bangladesh*, 2006 বইয়ে গবেষক ক্ষমতায়নকে মনস্তাত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষমতায়ন এবং প্রযুক্তিগত পর্যায়ে ক্ষমতায়নে বিন্যস্ত করে বিভিন্ন সূচকের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংকের উপর পরিচালিত গবেষণায় চমৎকার ফলাফল লক্ষ্য করেন। গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে জড়িত হবার পর মহিলাদের সচলতা বেড়েছে, কথা বলার স্বাধীনতা এবং চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়েছে। তবে

যৌতুক রোধে এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গ্রামীণ ব্যাংক তেমন কোন ভূমিকা রাখতে না পারলেও মহিলাদের জীবন যাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের পথ ধরেই ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে গবেষক মনে করেন।

Masuda Kamal, *Empowerment of Rural women A study on OSDER, A NGO working in Munshigonj district,* 2003 এতে গবেষক দেখিয়েছেন যে, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম হচ্ছে নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি মাধ্যম। কিন্তু গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়নি। মহিলাদের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রথম পদক্ষেপ কর্মসংস্থান, যা এনজিওরা অগ্রাহ্য করে বা ক্ষেত্র বিশেষ অস্বীকারও করে বলে গবেষক মনে করেন।

মোঃ ছাদেকুল আরেফিন, *ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ব্র্যাক কার্যক্রমের অবদান,* ২০০৭ উল্লিখিত গবেষণায় গবেষক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বলতে নারী সমাজকেই ইঙ্গিত করে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে ব্র্যাকের প্রভাব অনুসন্ধান করেন। এতে ক্ষমতায়নের সবগুলো সূচকে সফলতা না এলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্র্যাকের ভাল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন গবেষক।

AKM Ahsan Ullah, K Jayant Routray, *NGOs and development Alleviating Rural poverty in Bangladesh,* 2003 শীর্ষক গবেষণায় দেশের অন্যতম দুটো বৃহৎ এনজিও ব্র্যাক এবং প্রশিকার দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি এবং দেশের বিরাজমান দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে এর প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

Sara *C.* White, *Arguing with the crocodile : Gender and class in Bangladesh,* 1997 সারা হোয়াইট তার গবেষণায় বাংলাদেশ সহ ৩য় বিশ্বের প্রচলিত উন্নয়ন তত্ত্ব এবং প্রক্রিয়ার কঠোর সমালোচনা করেন। পশ্চিমা সাহায্য সংস্থাগুলো উদ্দশ্যমূলকভাবে শুধুমাত্র মাইক্রোক্রেডিট সংগ্রহ করার জন্যই গড়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন। নারী উন্নয়ন এবং সমতা নিয়ে যারা কাজ করছে তারা আসলেই সমতা চান কিনা এনিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তথাকথিত উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, ১৯৮৭ বইয়ে পিতৃতন্ত্র ও সামাজিক অসমতার উপর ক্রিয়াশীল নারীর অবস্থা কি ধরনের শোষণ নির্যাতনের শিকার তা

তুলে ধরা হয়েছে। নারীর সস্তা শ্রম, ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে আইন প্রণয়নও নারীর অধস্তনতাকে টিকিয়ে রেখেছে বলে প্রবন্ধগুলিতে প্রতিভাত হয়।

সৈয়দ হাশেমী, ***এনজিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো বিকল্প নয়,*** **১৯৯১** প্রবন্ধে এনজিও মডেল দরিদ্রদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পেরেছে কিনা বা অর্থনৈতিক ফলাফল সৃষ্টি ও সুষম বণ্টনের মাপকাঠিতে এনজিও মডেল দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে এনজিওদের দারিদ্র্য প্রীতি বাস্তবে কার্যকরী নয় বরং এনজিওরা নিজেদের লাভবান করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

আল মাসুদ হাসানউজ্জমান, সম্পাদিত ***বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,*** **২০০২** গ্রন্থটি মূলত: জেন্ডার বিষয়ক অনেকগুলো প্রবন্ধের সমাহার। এতে নারীর অবস্থানও অধিকার, নারীও রাষ্ট্র প্রবন্ধে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয় এবং নারী উন্নয়ন নীতি,নারী উন্নয়নে এনজিও এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা, লিঙ্গ বৈষম্য, গভর্ন্যান্স এ নারী, নারীর উপর পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা হয়েছে।

শাহীন রহমান, ***জেন্ডার প্রসঙ্গ,*** **২০০৭** জেন্ডার বিষয়ে তথ্যবহুল একটি বই। এতে নারী উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার, উন্নয়ন, জেন্ডার প্রেক্ষিতে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, পি,আর, এস, পি, জেন্ডার বাজেট নারী নির্যাতনের ধরন, প্রতিকার এবং জেন্ডার বিষয়ক পরিভাষাগুলো সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

খালেদা সালাহউদ্দিন, ***একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী,*** **২০০৬** গ্রন্থে লেখিকা নিজের লেখা নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমন, নারীর স্বাস্থ্য, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে নারী, নারীও কাজ, নারী উন্নয়নে আশার একটি গবেষণার উপর মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি একুশ শতকে বাংলাদেশের নারীসমাজ কোন পর্যায়ে তার উপর বিশে- ষণধর্মী লেখা এতে স্থান পেয়েছে।

সুলতানা খানম মোসতাফা, ***বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন: মীথ এবং বাস্তবতা,*** **২০০২** প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, দাতা গোষ্ঠীকে নারী উন্নয়নের কথা বলে আনা অর্থ দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উন্নয়ন মীথ হিসেবেই রয়ে গেছে। বাস্তবে নারীরা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, দারিদ্র্য

দূরীকরণ ব্যতীত অন্য কোন সুচকে এনজিওরা কাজও করে না। তাই তিনি মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

M Kabir & M.B Rahman, ***Rural Poverty and Demographic change: Evidence from village based women in development programs (seminar paper) USSP,*** **Mexico, 1994** প্রবন্ধটিতে দেখান যে, যেসব মহিলা পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করেন তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাও থাকে। সিদ্ধান্তগ্রহণ হচ্ছে নারী উন্নয়নের অন্যতম সূচক যেসব মহিলা গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে জড়িত তারা সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

সুলতানা আবেদা, ***নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশে-ষণ,*** **১৯৯৮ উইমেন ফর উইমেন,** প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি নীতি নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায় নারী উন্নয়ন হচ্ছে না বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। তিনি প্রশাসন, রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নারীর অধঃস্তনতার বিষয়টি দেখান। এ প্রসঙ্গে নারীর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে সুপারিশমালা তুলে ধরেন।

মোঃ ইসমাইল হোসেন, ***পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও এনজিও উদ্যোগ: একটি পর্যালোচনা***, শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এনজিওরা নারীর অর্থনৈতিক অধঃস্তনতার উপর গুরুত্বরোপ করে ঋণ দানের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করলেও ঋণ দানকেই মুখ্য হিসেবে বেছে নেয়, যা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সুফলদায়ক নয়। এক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থানের দ্বারা স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে বলে গবেষক মনে করেন।

রাশেদা আখতার, ***উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও, গ্রামীণ নারীর আর্থ সামাজিক পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা,*** **১৯৯৬** শীর্ষক গবেষণায় নারীর উন্নয়নে এনজিওদের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে গবেষক দেখিয়েছেন যে, ঋণের প্রভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তবে যৌতুক, পর্দা সম্পর্কে ধারণা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতিবাচক ধারণা রয়ে গেছে। উপসংহারে গবেষক বলেছেন যে, উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। উন্নয়ন সংশি—ষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগ নেই।

তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ১৯৯৫ শীর্ষক গ্রন্থে গবেষক সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর জন্য বরাদ্দ এবং মহিলা উন্নয়নে আইনগত দিক সমূহ নিয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন। গবেষক জাতিসংঘ কর্তৃক 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' নিয়ে আলোচনা করে মহিলা উন্নয়নে বিভিন্ন এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গবেষক সবগুলোরই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে কোন জরিপ কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ যাচাই করেননি। এটি গবেষণা কর্মের একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

প্রাসঙ্গিক রচনাবলির পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ইতিপূর্বে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত এনজিওদের অবদান শীর্ষক বিভিন্ন গবেষণা হলেও এই শিরোনামে গবেষণা খুব কম। বর্তমান গবেষণায় দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি এনজিও'র কর্মকৌশল দ্বারা নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটা কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা বের করার চেষ্টা করা হবে।

২.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ দরিদ্র। অধিকাংশ মানুষই তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নারীরা আরও দরিদ্রতর জীবন যাপন করছে। পাশাপাশি পরিবারে তারা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী হিসেবে বাস করে। সংসারে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করলেও তা অনুৎপাদনশীল কাজ হিসেবে গণ্য হয়। তাদের ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার খুবই কম। বাংলাদেশের আদমশুমারি অনুযায়ী নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। কিন্তু এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে সত্যিকারের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নেই বললে চলে। তাই এনজিওরা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প হাতে নিয়ে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে নিতে ব্রতী হয়েছে। সত্যিকারের কতটুকু আত্মনির্ভরশীলতা অর্জিত হচ্ছে তা এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেবল মানবেতর অবস্থা থেকে মুক্ত করলেই নারীর সার্বিক উন্নয়ন হবে তা নয়, পৃথিবীর সামনে যেসব সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে তার সমাধানেও নারীর ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। ক্ষমতায়ন একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হিসেবে

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে কল্যাণ, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনের মত শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়। নারী শুধু আয় করলেই হবে না, সেই আয়ের উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। তার নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সে তারা অর্থকে ব্যয় করতে পারবে- এটা ক্ষমতায়নের একটি প্রধান শর্ত। এনজিওরা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে। এক্ষেত্রে তারা কতটুকু সাফল্য লাভ করেছে তা দেখার জন্য এ গবেষণা আবশ্যক।

নারীকে ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প ইত্যাদি নানাভাবে এনজিওরা নারী উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় নারীকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া দাতা সংস্থাগুলো নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। যেহেতু উপকারভোগীদের ৯৮ শতাংশ নারী এবং কর্মী নিয়োগেও এনজিওরা নারীদের গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সুতরাং নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নই এনজিওগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই "নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওদের কার্যক্রম কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে বলে মনে করা যায়। তাছাড়াও এই গবেষণার মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণার সহায়ক হিসেবে গুরুত্ব পাবে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কর্মসূচি ও কর্মপন্থা নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতার বলা যায় বর্তমান গবেষণা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকার উপর আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃত ও সময়োপযোগী প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য সচেষ্ট হবে। পাশাপাশি গবেষণার যৌক্তিকতায় এটা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবর্তনের ধারায় এনজিও

মানবজাতি জন্মগতভাবেই মানবিক গুণাবলি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। পরবর্তীতে পরিবার ও সমাজ থেকে থেকে তার শিখন শুরু হয় এবং আমৃত্যু তা চলতে থাকে। এই ব্যক্তিগত গুণাবলির পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক শিখন মানুষকে নানাবিধ মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তারই ফলশ্রুতিতে মানুষ নানাবিধ কল্যাণকর কাজের সাথে যুক্ত হয়।

সুদূর অতীতকালে, যখন মানুষের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের ধারণা ছিল না তখন ব্যক্তি উদ্যোগে মানুষ মানুষের সেবা করতো, অনাহারী মানুষকে খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান করতো, বিপদ আপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতো। কালক্রমে মানুষ বাড়তে থাকল, প্রয়োজন দেখা দিল সমষ্টিগত প্রচেষ্টার। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো। প্রথমে স্বেচ্ছাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান শুরু করে। পরে তা পেশাগত রূপ ধারণ করে। আর আজকের এনজিও সেই ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি।

৩.১ এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বিবর্তন ও পটভূমি

বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে আজকের এনজিওর কথা বলতে গেলে এনজিওর বিবর্তনের ইতিহাস বলা দরকার। একদিনে এনজিওর সৃষ্টি হয়নি। কালের পরিক্রমায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

প্রাচীন কালের মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করতো অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের বস্ত্রদান, আর্তের সেবা, দুস্থ মানবতার কল্যাণের মাধ্যমেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এ বিশ্বাস থেকেই সমাজের অবস্থাপন্ন ধনিক শ্রেণি ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে দান-ধ্যান করতো। পরবর্তীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময় আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের পক্ষে সমাজের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছিল না। দেখা যায়, সময়ের সাথে সাথে সমাজের সমস্যাগুলো জটিল হতে থাকে। ফলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তি উদ্যোগে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা পরিচালনার মাধ্যমে এসব সমস্যার

সমাধান সম্ভবপর নয়। সামাজিক সেবা সমূহের মানোন্নয়ন এবং মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। ফলে সামাজিক সেবা সমূহের মানোন্নয়ন এবং মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে থাকে। এই অনুভবের থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকা সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজকল্যাণের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে অবদান রাখে।[১০]

৩.২বাংলাদেশে এনজিও

পরোপকার করা, বিপদে-আপদে পাড়া প্রতিবেশীদের পাশে এসে দাঁড়ানো, জনহিতকর কাজ করা, গরিব ও দুস্থ মানুষের সেবা করা প্রভৃতি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অন্তর্গত যা আবহমান কাল থেকেই আমাদের সমাজে চলে আসছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথম থেকেই রিলিফ বা সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার সূত্র ধরে বাংলাদেশে প্রথম আবির্ভাব ঘটে নতুন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার । সেই সময়ে বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি ম্যাকনামারার সদয় দৃষ্টি অনুন্নত ও পশ্চাৎমুখী দেশসমূহের গ্রামাঞ্চলে পতিত হওয়ার ফলে তারা গ্রাম উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁদের নতুন নীতি নির্ধারণ করেন।

১৯৭০ এর নভেম্বর মাসে স্মরণাতীতকালের প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে এদেশের উপকূল অঞ্চলের প্রায় তিন লাখ নর-নারী প্রাণ হারান। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন ও সম্পদহীন হয়ে পড়েন। প্রায় পাঁচ লক্ষ টন খাদ্য শস্য বিনষ্ট হয়। এর পরেই শুরু হয় বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই নতুন প্রজাতন্ত্রকে ও যুদ্ধাহত এই প্রজাতন্ত্রের হাজার হাজার নর-নারী, শিশু-কিশোর ও মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহায়তা করে বাঁচিয়ে রাখতে অনেক বিদেশি ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার আগমন ঘটে।

[১০] মুহাম্মদ সামাদ, "সমাজল্যাণের ধারণার বিবর্তন", দি জার্নাল অব সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬, পৃ: ৮৩

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মূলত এনজিও তৎপরতা শুরু হয়, যা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকান্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১১]

এরই মধ্যে জন্ম নেয় দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য-সংস্থা যা এখন এনজিও হিসেবে বহুল পরিচিত। বাংলাদেশে ব্র্যাক ও গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এ দুটি এনজিওর সূচনা হয় ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে কারিতাস জন্ম লাভ করে ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে ত্রাণ কার্যের মাধ্যমে।[১২]

সত্তর দশকেও বাংলাদেশে এনজিওর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। আশির দশকে এদেশে এনজিও কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। বেড়ে যায় দাতা সংস্থার পক্ষ থেকে অর্থসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধাদি। জনসংখ্যাধিক্যের এ দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা, সম্পদের অপ্রতুলতা ভাবিয়ে তোলে এদেশের সমাজ-সচেতন অগ্রগামী দেশপ্রেমিক জনগণকে। সুতরাং আশি থেকে নব্বই সালের মধ্যে বাংলাদেশের এনজিও কার্যক্রমের বৃদ্ধি ঘটে ব্যাপক ভিত্তিতে। বন্যা, খরা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ঘুরে ফিরে প্রতিবছর আঘাত হানে এ দেশের কোন না কোন অংশে। সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ যেমন দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসে তেমনি কাজের স্বচ্ছতা, গতিশীলতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার মাধ্যমে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে।[১৩]

বাংলাদেশে মোটামুটি ভাবে পাঁচ হাজার গ্রামে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। প্রথম ভাগে আছে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেগুলো অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নিজেরা সরাসরি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। দ্বিতীয় ভাগে আছে জাতীয় এনজিও, যেগুলো জাতীয় ভিত্তিতে নিজেদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। তৃতীয় ভাগে আছে স্থানীয় এনজিও। চতুর্থ ভাগে আছে সেবা প্রদানকারী এনজিও।[১৪]

---

[১১] মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, *গণতন্ত্রায়নে এনজিও*, ঢাকা: আরবান প্রকাশনা, ২০০০, পৃ: ১৩-১৫; সৈয়দ হাশেমী, "জিওদের জবাবদিহীতা", ঢাকা: উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭; মুহাম্মদ আব্দুর রব, বাংলাদেশের এনজিও: তৎপরতা বনাম অপতৎপরতা, ঢাকা: আইআরডি ও পিসিআরডি, ২০০৩, ১২

[১২] মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬-১৭

[১৩] এন. আই. গালিব, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮

[১৪] আনু মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২-১০

আন্তর্জাতিক এনজিওঃ বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কেয়ার-বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, রাড্ডা বার্নেন-সুইডেন, টেরেডেস হোমস-নেদারল্যান্ড, কনসার্ন-আয়ারল্যান্ড, মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি, ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারি এজেন্সি (যুক্তরাষ্ট্র), ভলান্টারি সার্ভিসেস ওভারসিজ (যুক্তরাজ্য), সোয়ালোস, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইত্যাদি।

জাতীয় এনজিওঃ জাতীয় এনজিও হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হচ্ছে- ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রশিকা, আশা, গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নিজেরা করি, কারিতাস, সিসিডিবি।

স্থানীয় এনজিওঃ স্থানীয় এনজিও হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হচ্ছে- গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ভি আর সি, রিক, সপ্তগ্রাম নারী পরিষদ, ঠেঙ্গামারা মহিলা সমিতি, ডাক দিয়ে যাই, গণ উন্নয়ন ইত্যাদি। এবং

সেবামূলক এনজিওঃ সেবামূলক এনজিওগুলো হচ্ছে এডাব, ভলান্টারি হেলথ সার্ভিসেস সোসাইটি, মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স সোসাইটি (মাইডাস) ইত্যাদি।[১৫]

স্বাধীনতা লাভের পর শুধু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এনজিও'র আত্মপ্রকাশ ঘটলেও বর্তমান সময়ে এনজিও কার্যক্রমের ধরন, প্রকৃতি, পরিব্যাপ্তি সকল ক্ষেত্রেই একটা অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। আশির দশকের দিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদেরকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে এবং বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে।[১৬]

যদিও প্রথম দিকে অর্থাৎ আশির দশকে এনজিওগুলো কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি অ্যাপ্রোচে সার্বিক সমাজ গঠনের ধারণাকে সামনে নিয়ে আসে এবং উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট হাতে নেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয় যে, এ ধরনের কার্যক্রমের ফলাফল সমাজের ধনীদের পক্ষে চলে যায়। ফলে পরবর্তীতে এনজিওগুলো টার্গেট পিপলস এপ্রোচে চলে আসে। এই রকম

---

[১৫] আনু মহম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০

[১৬] মোঃ হোসেন ইসমাইল, "পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও এনজিও উদ্দোগ: একটি পর্যালোচনা", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৬, ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৪, পৃ: ৭৭

নানা উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এনজিওরা নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার বেসরকারি সংস্থা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ধারণাগুলোকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধনকৃত এনজিও'র সংখ্যা ১৫৫২টি। এছাড়া সমাজসেবা, যুব উন্নয়ন, পরিবার-পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধনকৃত এনজিও'র সংখ্যা ২০০০।

বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহের মধ্যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রক্রিয়ার প্রায় অভিন্নতা বিদ্যমান। এনজিও তৎপরতার মূল লক্ষ্যই হল দরিদ্র শ্রেণি, বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের উন্নয়নে কাজ করা। এ সকল এনজিও পরিচালিত হয় মূলত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক নারী ও প্রান্তিক চাষি এবং দুস্থ অসহায় শিশুদেরকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ধর্মীয়ভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ এবং অবহেলিত আদিবাসীদের মধ্যেও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল এনজিও মূলত সমবেত পল্লী উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বয়স্ক-শিক্ষা, মৎস্য ও পশুপালন, সামাজিক বনায়ন, যুব উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম করে থাকে।

এনজিওসমূহের এ কর্মসূচি মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. মানবিক উন্নয়ন ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি;
৩. লাগসই প্রযুক্তির বিকল্প ও সামাজিক সেবা সম্প্রসারণ।

আবার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে অভিন্নতা থাকলেও এনজিওগুলোকে তাদের প্রধান মনোযোগ অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. ধর্মীয় সংস্থা- আন্তর্জাতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা হিসেবে এ সংস্থা কাজ করে। চার্চের সাথে সম্পর্কিত খ্রিস্টীয় সংস্থা ছাড়াও সাম্প্রতিককালে সৌদি আরব, কুয়েত ও লিবিয়ার তহবিল নিয়ে বেশ কিছু ইসলামি সংস্থা কাজ করছে।

২. আয় বৃদ্ধিকারী সংস্থা- যে সব এনজিও ঋণ প্রদান, বিভিন্ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ গরিব ও ভূমিহীনদের অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বা উদ্যোগী কোন কর্মসূচি দেয়।

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানকারী সংস্থা।

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনায় নিয়োজিত সংস্থা।[১৭]

এনজিওরা নারীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে বেছে নিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠান দল গঠনের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদন ও আয় উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। সাথে সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চাল করেছে।

তবে বর্তমানে এনজিও কার্যক্রমের কয়েকটি নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস প্রদানকারী এনজিও বাদে অন্যসব এনজিওগুলোর একটি প্রধান কার্যক্রম হিসেবে চলে এসেছে ঋণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রতিটি এনজিওতেই উপকারভোগী হিসেবে কেন্দ্রে অবস্থান করে নারী এবং নারীকে ঘিরেই পরিবারের উন্নয়ন আবর্তিত হয়। এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে নারী নিজে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে অথবা পরিবারের সদস্যদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে। ফলে পরিবারে স্বচ্ছলতা আসে। এছাড়া পরিবারে একমাত্র নারীর ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা থাকায় পরিবারে মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ ও সচেতন মানবসম্পদ রূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে।[১৮]

এনজিওগুলোর দাবি যে, তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের উন্নয়ন কতটুকু হচ্ছে বা হচ্ছে না তা 'নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা'র মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

---

[১৭] আনু মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২-১৩, মোঃ হোসেন ইসমাইল, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০

[১৮] এজাজুল হক চৌধুরী, *মানবিক উন্নয়ন*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ: ২৩

৩.৩ এনজিও'র প্রয়োজনীয়তা

দরিদ্র মানুষের সমস্যা বহুবিধ। মূলত এই সমস্যা আবর্তিত হচ্ছে জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। উৎপাদনমূখী কর্ম-সংস্থানের সুযোগের স্বল্পতা, শ্রমের কম উৎপাদনশীলতা এবং নিম্ন মজুরি এগুলোকে দরিদ্রতার স্থায়িত্ব বৃদ্ধির সহায়ক প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ করে বেকার সমস্যাই অন্যান্য সমস্যাকে প্রভাবিত করে দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের আরো গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী অত্যন্ত সংগ্রামী, উদ্ভাবনী ও কঠোর শ্রমের মানসিকতার হলেও শিক্ষা হীনতা, প্রশিক্ষণের অভাব ও পুঁজির স্বল্পতার জন্য তা কোন কাজে আসছে না।

তাই এ দেশের দরিদ্র মানুষের মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধান তথা আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর করে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুঁজির ব্যবস্থা করা।[১৯]

সমাজ সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে ব্যবধান এক ধরনের শ্রম বিভাজনকেই বুঝায় যা নারীর কাজের ক্ষেত্রকে পরিবারের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এমনকি পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে থেকে উপার্জনক্ষম কোন কাজ করলেও বিক্রয়জাত করার সময় নারী অদৃশ্য বিধায় সামাজিকভাবে তাদের মূল্যায়ন হয় না। শ্রমের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের নিয়ন্ত্রণও চলে যায় পুরুষের হাতে।[২০]

নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অভাব পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা হ্রাস করেছে। অর্থনৈতিক পরিমন্ডলেও নারীর গৃহের কাজ স্বীকৃতিহীন ও পারিশ্রমিকবিহীন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের কাজ কম দামি ও অবমূল্যায়িত। অর্থনৈতিক বিচারে সেই দেশকেই অধিকতর সফল বিবেচনা করা হয়, যারা তাদের নারীদের কাজের মূল্যায়ন করে এবং সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘ তাই মানব উন্নয়ন সূচকের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়ন সংযুক্ত করেছে। অথচ

---

[১৯] মোঃ আবুল হোসেন, মোকাম্মেল হোসেন, *উন্নয়ন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯, পৃ: ৯

[২০] রাশেদা আখতার, "উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও, গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ১, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬, পৃ: ৩

বাংলাদেশ এখনও তাদের নারীদের অর্থনৈতিক উৎপাদকরূপে উপেক্ষা করে তার নিজস্ব উন্নয়নকে আড়াল করছে।[২১]

পুরুষের সঙ্গে সহ অবস্থানে, সমমর্যাদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন। নারীও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন বহুমাত্রিক, যার সঙ্গে নারীও জড়িত। সমাজে যে সকল কর্মকান্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না।

সাম্প্রতিককালে নারী উন্নয়ন বলতে কেবলই নারীর আয় বৃদ্ধি করে তার দারিদ্র্য দূর করাকে বুঝায় না বরং তা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও একীভূত করে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নীতি-নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের দিক নির্দেশনা খোঁজা হচ্ছে। নারী-উন্নয়ন সমাজের সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত।[২২]

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। আর নারীর অবস্থা পুরুষের চেয়ে আরও খারাপ। অর্থাৎ এ দেশের নারীরা 'দরিদ্রেরও দরিদ্র, দীনেরও দীন। যেহেতু এ দেশের নারীরা এ সমাজের দরিদ্রতার অংশ। এ কারণেই দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীর ভূমিকা রয়েছে।[২৩]

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী এখনও পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পুরুষেরা দৈনিক জনপ্রতি ১৯২৭ কিলো ক্যালোরি গ্রহণ করে, যেখানে মহিলারা গ্রহণ করে

---

[২১] মোহাম্মদ শাহীন খান, তাহমিনা আখতার, "নারী নির্যাতন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৫, ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৩, পৃ: ৫৭

[২২] আবেদা সুলতানা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশে-ষণ", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ২, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮, পৃ: ১১৫; Srilatha Batliwala, *The Maching of Women's Empowerment,* India: Women's World, 1995, 35; Shanti Chandra Kohli, "Women and Empowerment", Indian Journal of Public Administration, Vol-XLIII, No-3, July-September, 1997, p. 27

[২৩] নিলুফা পারভীন, "দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর ভূমিকা", উন্নয়ন পদক্ষেপ, ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮, পৃ: ৫

১৫৯৯ কিলো ক্যালোরি। নারী-নির্যাতন এদেশে একটি মারাত্মক সমস্যা। ধর্ষণ, যৌতুক, নারী পাচারসহ নানারকম যৌন পীড়নের শিকার তারা। সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা নেই।[২৪]

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে মাতৃ মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৩ জন। ১-৪ বছরের মেয়ে শিশু শতকরা ৫০ ভাগ ছেলেদের চেয়ে মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতিতে যে অবস্থান তা অনেক ক্ষেত্রে সহানুভূতিনির্ভর, আরোপিত কিংবা সৌজন্যমূলক।[২৫]

বাংলাদেশের দরিদ্র নারীদের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৈন্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এনজিওরা কাজ করে যাচ্ছে। এনজিও তৎপরতার মূল লক্ষ্যই হল দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নে কাজ করা। এনজিও সমূহ মানবিক উন্নয়ন ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি ও লাগসই প্রযুক্তির বিকল্প ও সামাজিক সেবা সম্প্রসারণে কাজ করে থাকে।[২৬]

বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা এনজিওরাই শর্তহীনভাবে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় এসব পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে। এ ব্যাপারে এনজিওদের ঋণদান কর্মসূচি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের দুয়ারে আর্থিক সেবা ও ব্যবস্থাপনা পৌঁছে দেয়ার কাজ বহু দেশি-বিদেশি এনজিও করে যাচ্ছে। তবে দারিদ্র্য বিমোচনের এই কর্মকান্ড গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বিদেশি গোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভর করে।[২৭]

এনজিওগুলো মূলত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টাকা বিনিয়োগের প্রতি মনোযোগ, নারীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্যে সঞ্চয়, ঋণদান কর্মসূচি, স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

---

[২৪] বেগম হামিদা আখতার, পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে নারীর মানসিক সুস্থতাবোধ, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৩, ২০০০, পৃ: ৪৩

[২৫] মোঃ রেজাউল ইসলাম, "লিংগ বৈষম্য: বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত", দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮, ৪০

[২৬] মোঃ ইসমাইল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭-৮

[২৭] মোঃ আবুল হোসেন, মোকাম্মেল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টির ফলে নারীর একদিকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে- সেই সাথে গোটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। যার জন্যে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ এনজিও নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ ও কর্মসূচির প্রাধান্য দিয়েছে। এনজিওরা ৬০ শতাংশ নারীদের সমাজ-সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে বেশি।[২৮]

ঋণ দরিদ্র মানুষকে বিশেষ করে নারীদেরকে দারিদ্র্যের বিষচক্র থেকে বের করে আনতে পারে, তার নিজস্ব সামর্থ্যের যথাযথ স্ফুরণ সম্ভব করতে পারে। তাকে একজন সক্রিয় অর্থনৈতিক কর্মীতে পরিণত করতে পারে। সর্বোপরি তার নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে।[২৯]

নারী উন্নয়নে এনজিও কার্যক্রমের কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরা হল-

১. সামাজিক কাঠামো

এনজিও কার্যক্রমের অভিনবত্ব হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করা। এই সংগঠন একটি সামাজিক অবকাঠামো। কারণ বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো সংগঠিত হলে তাদের ক্ষমতায়নের ভিত তৈরি হয়, উন্নয়নের বার্তা এবং সামাজিক সেবা পৌঁছে দেয়া অনেক সহজ হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ এনজিওর মাধ্যমে সুযোগ লাভ করছে। দরিদ্র মানুষ সংগঠিত হলে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। ফলে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি সময় এবং পরবর্তীতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনাও অনেক সহজ হয়ে যায়। এনজিওরা দরিদ্র মানুষদের গ্রুপ ভিত্তিক সেবা প্রদান করে থাকে।

[২৮] রাশেদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬

[২৯] মুহাম্মদ ইউনূস, *বাংলাদেশ ২০১০*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ: ২৫

২. অভিগম্যতা

এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা আত্মপ্রত্যয়ী ও উদ্যোগী হচ্ছে।

৩. অংশগ্রহণ

উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪. বিকল্প তথ্য মাধ্যম

এনজিওরা উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা ও যে কর্মসূচিগুলো হাতে নিয়েছে এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা তৃণমূল মানুষদের নিকট পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এসব তথ্য দরিদ্র মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের এবং সচেতন করে তুলতে ভূমিকা রাখছে।

৫. দারিদ্র্যের ক্ষমতায়ন

উন্নয়ন, দারিদ্র্য বা নারী বিষয়ক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন ক্ষমতা থেকে উৎসারিত। ক্ষমতা বলতে বস্তুবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ বুঝায়। এনজিওরা দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করতে চায়। সেজন্য তারা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

৬. নারীর ক্ষমতায়ন

পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শে লালিত সমাজ নারীদেরকে সমাজের মূল উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তাদেরকে দরিদ্রদের দরিদ্র করেছে। আর এনজিওরা এ গোষ্ঠী তথা নারীকে সংগঠিত করছে। এর মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নও হচ্ছে। যেমন:

ক. নারীরা ঘরের বাইরে সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছে;

খ. তাদের গতিশীলতা বাড়ছে। বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে;

গ. সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধি মূলক প্রকল্প গ্রহণ করছে;

ঙ. নির্যাতিত হলে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করতে পারছে।

৭. শিক্ষা ক্ষেত্রে

বাংলাদেশে নারী-শিক্ষার হার পুরুষের চেয়ে অনেক কম। শিক্ষায় নারী-পুরুষের হারে বড় ধরনের ব্যবধান রয়েছে। বিভিন্ন এনজিও নারী শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে।

৮. কর্মক্ষেত্রে

কর্মক্ষেত্রে স্বল্প মজুরি ও কর্ম ঘণ্টা নির্ধারণে নারী বৈষম্যের শিকার। তাছাড়া আনুপাতিক হারেরও ব্যবধান অনেক। কর্মক্ষেত্রে শিশু রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ না থাকায় নারীকেই এর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। ফলে এ ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। এনজিওরা নারী নিয়োগের হার বৃদ্ধি করছে এবং নারী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। কোন কোন এনজিওতে ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে।

সর্বশেষে বলা যায়, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে বাংলাদেশে এনজিওর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রের পক্ষে সকল মানুষের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। তাই এনজিওরা তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী সম্প্রদায়ের দক্ষতা উন্নয়ন, পুঁজি সরবরাহসহ বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। একটি পরিবারের কেন্দ্রে নারীর অবস্থান। তাই নারীকে ঘিরে পরিবারের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনে এনজিও বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

এনজিওদের নারী উন্নয়ন কর্মসূচি

এনজিওদের উন্নয়ন কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের সাথে। তারা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করবে এবং মর্যাদা নিয়ে ও স্বাধীনভাবে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। গবেষণার বিষয়বস্তু "নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা" (নির্বাচিত একটি জেলা সদরের উপর সমীক্ষা) হওয়ায় প্রথমেই বাংলাদেশের এনজিও সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আবশ্যক। তাই বাংলাদেশের এনজিওদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল এনজিওসমূহকে গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। এসব এনজিওর উৎপত্তি, জেন্ডার পলিসি এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জানলে বাংলাদেশের এনজিও সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা সহজ হবে।

বর্তমান গবেষণায় দুটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন-

ক. প্রথম পর্যায়ে আটটি এনজিও যথা- ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, বাংলাদেশ, নারী প্রগতি সংঘ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ্ কোয়ালিশন এবং দুর্জয় নারী সংঘের ম্যানুয়াল, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য দলিলপত্র পর্যালোচনায় তাদের নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সাধারণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখিত এনজিওসমূহের মধ্যে একটি এনজিওর উপকারভোগী নারীদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.১ গবেষণাধীন এনজিওসমূহ

বাংলাদেশের এনজিওদের কাজের ধরন, ক্ষেত্র, তাদের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী মোটামুটি একই রকম। তবে এদের ব্যাপ্তি ও পরিধি বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের, জাতীয় পর্যায়ের, স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও কাজ করছে। জাতীয় পর্যায়ের এনজিওদের মধ্যে আবার দুটি অংশ রয়েছে। যেমন- ক) উপকারভোগীদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছে, খ) উপকারভোগী শুধু নারী। গবেষণার সুবিধার্থে নারী-পুরুষ সুবিধাভোগী জাতীয় এনজিও ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক এবং নারী সুবিধাভোগী জাতীয় এনজিও বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ্ কোয়ালিশন ও দুর্জয় নারী সংঘ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে। তবে বর্তমান গবেষণায় নারী-পুরুষ উপকারভোগীদের নিয়ে কাজ করা জাতীয় এনজিও ব্র্যাক সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১.১ নারী-পুরুষ উপকারভোগী সংশি- ষ্ট জাতীয় এনজিও

ক. ব্র্যাক

ব্র্যাক জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। পুরো নাম 'বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (Bangladesh Rural Advancement Committee) সংক্ষেপে ব্র্যাক। স্বাধীনতার পর পর ১৯৭২ সালে এটি রিলিফ কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। ব্র্যাক সিলেটের সাল্লা গ্রামে প্রথম কাজ শুরু করে। যুদ্ধ শেষে যেসব শরণার্থীরা ফিরে আসছিল তাদের নিয়েই মূলত এরা রিলিফের কাজ শুরু করে। এসব ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর তৈরি করে দেয়া, খাদ্য বস্তু প্রদান, বস্ত্রসহ নানাবিধ ত্রাণ বিতরণ। শাল্লার অভিজ্ঞতা থেকে ব্র্যাক নেতৃত্ব উপলব্ধি করেন যে, এভাবে বাড়িঘর নির্মাণ বা জরুরি ত্রাণ সাহায্য দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব। এইসব অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে ব্র্যাক একটি এনজিও হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমানে ব্র্যাক দক্ষিণ গোলার্ধ ভিত্তিক বিশ্বের প্রধান বেসরকারি সংস্থাগুলোর অন্যতম। ব্র্যাকে কাজ করছে ৯০ হাজার ৬শ' ৯৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি। কর্মিদল, সংগঠনের সদস্য, উদ্যোক্তা এবং সংশি- ষ্ট সবাইকে নিয়ে ব্র্যাকের কর্মধারা বর্তমানে আনুমানিক ১২৬ মিলিয়ন মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ১০টি দেশে এবং ২০১২ সাল থেকে একাদশ দেশ ফিলিপাইনে পরিচালিত ব্র্যাকের কাজ বৈশ্বিক আন্দোলনরূপে মানুষের জীবনে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের

দুয়ার খুলে দিয়েছে। যাদের মধ্যে এই প্রত্যাশিত পবির্তন সূচিত হয়েছে তাদের মধ্যে উপকারভোগী অধিকাংশই হল নারী। জনাব স্যার ফজলে হাসান আবেদের নেতৃত্বে ৪০ বছর আগে যে ব্র্যাকের সূচনা সেই ব্র্যাক আজ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রদূত হিসেবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[৩০]

ব্র্যাক প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নারীদের অবস্থা খুবই করুণ। নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। বর্তমানে ব্র্যাক বাংলাদেশের প্রায় সবকটি থানায় কাজ করছে। তার কাজের ক্ষেত্রও ব্যাপক। ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ কার্যক্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, পুষ্টি, স্যানিটেশন, রেশম, মৌমাছি, সবজি ইত্যাদির চাষ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ কাজ করে। গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ব্র্যাক নগর দারিদ্র্য নিয়েও কাজ শুরু করেছে।

খ. প্রশিকা

বাংলাদেশের একটি বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। যুদ্ধোত্তর দেশে যখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল না এবং একটি দুর্ভিক্ষকে পাড়ি দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষ যখন নাজেহাল অবস্থায় আছে তখন প্রশিকার জন্ম। ১৯৭৬ সালে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে জন্ম প্রশিকার। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় কানাডিয়ান সিডার অর্থানুকূল্যে এই সংস্থা প্রথম কাজ শুরু করে। প্রশিকা তার জন্ম লগ্ন থেকেই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ও মানবিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে চলেছে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য, পরনির্ভরতা এবং শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে গ্রামীণ গরিবদের সহায়তা প্রদান। প্রশিকা মানে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কাজ- এই তিনটি শব্দের আক্ষরিক ও মর্মগত অর্থের প্রয়োগ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই তার সার্বিক কর্মকান্ড এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুরে প্রশিকা কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঋণ কার্যক্রম, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম, সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, জেন্ডার কার্যক্রম ইত্যাদি। বর্তমানে এ সংস্থার প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৬৮,৮৯৭টি এবং সদস্য সংখ্যা ১২,৯৬,৯২২ জন। এখানে কর্মরত রয়েছে ৩,০০০ এর বেশি কর্মী।

গ. গ্রামীণ ব্যাংক

[৩০] *একনজরে ব্র্যাক*, ব্র্যাক প্রকাশনা, পৃ: ১; ব্র্যাক বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে একটি ভিন্নধর্মী ব্যাংক হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক। এর লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের কাছে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস হচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকের স্বপ্ন দ্রষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামের ভূমিহীন নারীদের করুণ অবস্থা দেখে ড. ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হন। তিনি মনে করেন, পুঁজি যদি দরিদ্র নারীদের কাছে সহজ করা যেত তাহলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারতো।

১৯৭৬ সালে জোবরা গ্রামে 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' নামে একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চালু করেন। প্রকল্পটি সর্বপ্রথম জনতা ব্যাংকের সহায়তায় ভূমিহীনদের ঋণ প্রদান শুরু করে। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে ড. ইউনূসের অনুরোধে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জোবরা গ্রামে একটি পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা চালু করে। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় ২৪টি পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা খোলা হয়। পরিশেষে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকল্পটি গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

এর ঋণ গ্রহীতা মূলত নারীরা। এদের সংখ্যা ৯৬%। গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ প্রদান, শিক্ষা ঋণ, ভিক্ষুকদের সুদবিহীন ঋণ ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংকের ১২২৯টি শাখা অফিস রয়েছে। এই ব্যাংক ৪৪, ৬৩৬টি গ্রামে কাজ করে এবং মোট কর্মীর সংখ্যা ১১,৯৮৮ জন।

ঘ. আশা

আশা মূলত ঋণ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে। এটা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ সালে শুরু করার পর এ পর্যন্ত আশা ঋণ কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইউ এন ডি পি তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সেবা প্রদানের জন্য আশাকে আন্তর্জাতিক কৌশলগত সেবা প্রদানকারী হিসেবে নির্বাচিত করেছে। মোট ৬৪টি জেলায় ৭,৮৬০টি ইউনিয়নের ৬১,৬২৫টি গ্রামে কাজ করে আশা। মোট সদস্য সংখ্যা ৫৬ লক্ষ এবং কর্মীর

সংখ্যা ১৪,০৩৫ জন। আশার সদস্য সংখ্যা ৭০ লক্ষে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ প্রদান শুরু হয়েছে।[৩১]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত এনজিওগুলোর প্রায় ৯৫ শতাংশ সদস্যই নারী। বাকি ৫ শতাংশ পুরুষ সদস্য।

৪.১.২ নারী উপকারভোগী সংশি- ষ্ট জাতীয় এনজিও

জাতীয় পর্যায়ের এনজিও হিসাবে নিম্নোক্ত এনজিওগুলো কাজ করে। তবে এদের কর্মকান্ড শুরু মাত্র নারীদের নিয়ে।

ক. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ বা বিএনপিএস এর জন্ম ১৯৮৬ সালে। এই সংঘ নারীদের উন্নয়নে কাজ করে। সারাদেশের নারীদের দ্যারিদ্র বিমোচনে অনেক সংস্থা কাজ করে। এতে হয়তো উপকারভোগীরা এবং তার পরিবারের সদস্যরা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতার মুখ দেখে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নারীর উন্নয়ন কতখানি হয় তা প্রশ্নবিদ্ধ। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই শুধু গুরুত্ব দেয় না, তার ক্ষমতায়নের বিষয়ে ততোধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ মনে করে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন না হলে তারা কখনোই উন্নয়নের মূল স্রোতে মিলিত হতে পারবে না এবং উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবে না। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ শহর এবং গ্রামীণ উভয় প্রকার নারীদের নিয়ে কাজ করছে। এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

খ. নারী উদ্যোগ কেন্দ্র

নারী উদ্যোগ কেন্দ্র (নউক) একটি বেসরকারি নারী উন্নয়ন সহায়ক সংগঠন। এই সংগঠন ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নউক জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও নারীর সমানাধিকার রক্ষায় কাজ করে। সিদ্ধান্ত

---

[৩১] BRAC, *Annual Report*, Dhaka, 2004, p. 10; PROSHIKA, *Annual Report*, 2004, p. 5; Grameen Bank, *Annual Report*, 2004, p. 7; ASA, *Annual Report*, 2005, p. 2-3; আনু মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, ১০৮; Muhammad Yunus, *Grameen Bank at a Glance*, Dhaka: Grameen Bank, 2004, p. 1.

গ্রহণ ক্ষমতার অভাব, সহিংসতা এবং নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীরা অনগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। পুরুষের সাথে সাথে যাতে নারীরাও সমাজের নেতৃত্ব, পরিবার ও জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, পলিসি উন্নয়ন এবং কাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে সেভাবে তাদের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক নারী সংগঠন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সংগঠন প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে নিজেদের মেধার স্ফুরণ ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে না। নউক মূলত সারাদেশে বিস্তৃত নারী সংগঠনগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে এসেছে। এতে করে সারাদেশের নারী সংগঠনগুলো পরস্পরের কার্যক্রম, নীতি, পরিকল্পনা ও সুবিধা-অসুবিধা জানতে পারছে, ধারণা বিনিময় করতে পারছে। নউক মূলত এই নেটওয়ার্কের নেতৃত্ব ও সঞ্চালনের ভূমিকায় আছে।

গ. বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ্ কোয়ালিশন (Bangladesh Women's Health Coalition, BWHC)

বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ্ এর উৎপত্তি ১৯৮৫ সালে। এই সংগঠন প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক নারী, শিশু ও কিশোরীদের নিয়ে কাজ করে। সংগঠনটি একটি নারী সংগঠন। এরা তাদের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সুবিধা, বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং কমিউনিটি এডুকেশন দিয়ে থাকে। সংগঠনটি বিশ্বাস করে, জেন্ডার অ্যাপ্রোচ, কমিউনিটির অংশগ্রহণ, সমন্বিত কার্যক্রম এবং সরকারি ও অন্যান্য সমমনা সংগঠনের সাথে কাজ করার মাধ্যমে নারী জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

ঘ. দুর্জয় নারী সংঘ

১৯৯৮ সালে কেয়ার বাংলাদেশ-এর এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প 'শক্তি' ও 'নারীপক্ষ' যৌথভাবে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন স্থানের যৌনকর্মীরা অংশ নেয়। কর্মশালায় বিভিন্ন মতবিনিময়ের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের মধ্যে একটি নতুন বোধের সৃষ্টি হয়। 'মানুষ হিসেবে আমাদেরও রয়েছে বাঁচার অধিকার'- এই বোধ থেকেই ১৯৯৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি যৌনকর্মীদের সংগঠন 'দুর্জয় নারী

সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভাসমান যৌনকর্মীদের জন্য কার্যক্রম, ড্রপ-ইন-সেন্টার, যৌনকর্মীদের শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি। [৩২]

৪.২ উপকারভোগীদের জন্য এনজিওর উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট সংখ্যা দরিদ্র। তবে নারীরা পুরুষের চাইতে অধিকতর দরিদ্র। দেখা যায় একটি পুরুষ-প্রধান পরিবারের চেয়ে নারী-প্রধান পরিবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিমজ্জিত। শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে নারীর অসম সুযোগ সমাজের এসব পক্ষপাতদুষ্টতার ফলে নারীরা আরও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে।

সত্তর এর দশকে নারীকে যখন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার চিন্তা ভাবনা করা হয়, তখন মনে করা হত নারীরা কাজ করে না, তাই তাদের হাতে বাড়তি সময় আছে যা সম্পূরক আয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রথম দিকে দেখা যায় যে, নারীরা এমন সব পণ্য উৎপাদন শুরু করে- যা বাজারজাত করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। নারীদের অত্যন্ত নিম্ন মজুরি দেয়া হতো। কারণ ধরেই নেয়া হতো এসব কাজ তারা বাড়তি বা অবসর সময়ে করছে। তবে সময়ের সাথে সাথে এসব ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন নারীর বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এসব সংস্থা নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী কের তোলার জন্য কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।[৩৩]

৪.২.১ নারী-পুরুষ উপকারভোগী সংশি- ষ্ট জাতীয় পর্যায়ের এনজিওদের কার্যক্রম

এনজিওরা গত তিন দশকে সাড়ে তিন মিলিয়ন গ্রামীণ নারীর সাথে কাজ করে একটা বিরাট সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় বিরাট পরিসরে বিভিন্ন বিষয় (Intervention) নিয়ে কাজ করছে। নারীর প্রকৃত উন্নয়ন বোঝার জন্য এনজিও কার্যক্রমগুলো বিস্তারিত জানা দরকার।

---

[৩২] Bangladesh Nari Progoti Sangha, *Annual Report*, 2004, p. 3; Bangladesh Nari Uddog Kendra, *Annual Report*, 2004, p. 7; Bangladesh Women's Health Coalition, *Bulletin*, 2005, p. 1-4,7; দুর্জয় নারী সংঘ, *বুলেটিন*, ২০০৫, পৃ: ১-৪।

[৩৩] রাশেদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫; শাহীন রহমান, *দারিদ্র্য বিমোচন ঃ বাস্ড়বতা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৩য় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ: ৮২।

৪.২.১.১ ঋণ, বীমা ও সঞ্চয় কার্যক্রম

ঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার। প্রচলিত ব্যাংকিং প্রথায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশের সুযোগ কম থাকায় তারা সেখান থেকে অর্থ ঋণ নেয়া, সঞ্চয় ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে পারে না; ফলে তারা ক্রমাগত দরিদ্র হতে থাকে। ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য, ঋণকে গ্রামীণ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি এনজিওর ঋণ বীমা এবং সঞ্চয় কার্যক্রম রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে মিল রয়েছে, তবে এনজিও ভেদে কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ কিছুটা কম-বেশি হয়ে থাকে। এই কার্যক্রমের আওতায় যে সব কর্মসূচি রয়েছে তা নীচে আলোচনা করা আবশ্যক।

ক. ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রায় সব এনজিওই ঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। এনজিওরা এসব ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদেরকে অর্থের জোগান দেয় যাতে তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রম গরিবদের বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি স্ব-টেকসই (Self-Sustainable) এবং বিশ্বাসযোগ্য অর্থ সেবা কার্যক্রম গড়ে উঠেছে। গ্রাম সংগঠন সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধক কার্যক্রমের জন ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ পাবার আগে সদস্যদের ব্র্যাকের কাছে কিছু সঞ্চয় করতে হয়। ব্র্যাক ১০০০ টাকা থেকে শুরু করে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। সেবা মূল্য ১৫ শতাংশ, সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ২০০২ সালে ২.৯ মিলিয়ন সদস্যকে ১,৭০৭ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। ঋণ ফেরতের হার ৯৯%। প্রশিকা ক্ষুদ্র অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চালু করে। এর মাধ্যমে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিনটি মেট্রোপলিটান শহর ও ৭৪টি প্রশিকা 'এরিয়া উন্নয়ন কেন্দ্রের' আওতায় কারিগরি সহায়তা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক পরামর্শ ও বিপণন সুযোগ তৈরিতে সহযোগিতাসহ ১,৬৪০ এবং ২,৭১০ জন উদ্যোক্তাকে ২,৩৯.২৯ মিলিয়ন এবং ১১৭ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধক কর্মকান্ডে ৬৪,৭৭০টি প্রকল্পের বিপরীতে ৪,০৮৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ টাক এবং ৭১ শতাংশ প্রকল্প নারীদের জন্য বরাদ্দ ছিল।

দলীয় সদস্যদের স্বল্প খরচে বাড়ি তৈরির জন্য প্রশিকা এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই কর্মসূচি দরিদ্রদের জন্য আশার আলো নিয়ে এসেছে।

দরিদ্রদের মধ্যে নারীরা আরও দরিদ্র তাই তারা এই কর্মসূচির মাধ্যমে একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রশিকা ঋণ দিয়ে থাকে।

২০০০ সালের শেষ থেকে গ্রামীণ ব্যাংক একটি নতুন ঋণ পদ্ধতি চালু করে। এই নতুন ব্যবস্থাটি অনেকটাই সরল ও গ্রাহক বান্ধব যার মাধ্যমে একই সাথে স্বাভাবিক এবং দুর্যোকালীন সময়ে কাজ চালানো সম্ভব হবে। এই সিস্টেম চার ধরনের ঋণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে- ক) মূল ঋণ, খ) গৃহ ঋণ, গ) উচ্চশিক্ষা ঋণ, ঘ) ভিক্ষুক পুনর্বাসন ঋণ।

১৯৮৪ সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহ ঋণ চালু করে এবং এটি ঋণ গ্রহীতাদের নিকট খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। একটা গৃহের মালিক হলে তা একজন নারীর তথা মানুষের আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া ঐ নারী তার নিজ ও পরিবারের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। একজন সদস্য একটি টিন শেড ঘরের জন্য ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে থাকে। গৃহ ঋণে সুদের হার ৮% এবং দশ বছর সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৭৭.৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ২০,৪৭৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক ভিক্ষুক শ্রেণিকে পুনর্বাসিত করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০০২ সালের জুলাই মাস থেকে এই কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। ভিক্ষুকদের মধ্যে যারা অক্ষম, অন্ধ একই সাথে বৃদ্ধ ও অসুস্থ তাদেরকে এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল ভিক্ষুকদের অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করা। তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাবার সুযোগ তৈরি করা। এই কর্মসূচিতে ঋণ গ্রহীতা সাপ্তাহিক দুই টাকা হারে ঋণ পরিশোধ করে। কোন অর্থ প্রদান না করেই তারা জীবনবিমা সুবিধা ভোগ করে। প্রত্যেক সদস্য নাম ও ছবিসহ একটি পরিচয়পত্র ব্যবহার করে। ভিক্ষার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। ২০০৩ সাল নাগাদ এই কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৪৭৮ জন।

অনেক সময় নারীরা বিভিন্ন কারণে ব্যবসা বড় করতে চায়, যেমন- বাজারজাত করার সুযোগ বৃদ্ধি, পরিবারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ-সদস্যের সহযোগিতা ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংক এইসব নারীকে বেশি পরিমাণে ঋণ দেয় যা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ। এই ঋণের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। এ পর্যন্ত ট্রাক, পাওয়ার টিলার, ইরিগেশন পাম্প, পরিবহণ যান, যাতায়াত এবং মাছ ধরার জন্য নৌযান ক্রয়ের

জন্য ১,০৪,৫৮০ জন সদস্য ২.৩০ বিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া গ্রামীণ ফোন সার্ভিসের জন্য নারীদের ঋণ দেয়া হয়।

আশা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে ব্যক্তিকে ঋণ দেয়। এক্ষেত্রে দলের কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। একজন ব্যক্তি সদস্য হওয়ার চার সপ্তাহের মধ্যে ঋণ পায়। ঋণ প্রদানের জন্য ১৫ দিন পর থেকে কিস্তি প্রদান শুরু হয়। স্মল লোন প্রোগ্রামে যে সব নারীকে এই কর্মসূচির আওতায় এনেছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওইসব নারীদেরকে পুঁজি দিয়ে সাহায্য করা যাতে তারা বা তাদের পরিবার ছোট আকারে আয় বর্ধক কর্মকান্ডে জড়িত হতে পারে।

এর মাধ্যমে নারীরা দুই ভাবে লাভবান হয়- প্রথমত: তাদের পরিবারের আয় বাড়ে; দ্বিতীয়ত: নারীরা ক্ষমতায়িত হয়। প্রাথমিকভাবে শহর এলাকায় ৬,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা এবং গ্রাম এলাকায় ৪,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এই ঋণ ৪৬টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। সেবা মূল্য ১৫ শতাংশ। ২০০৩ সাল পর্যন্ত আশার সদস্য ২২,৫৩,৫৯২ জন। এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে ৭৪,১৮৩ মিলিয়ন টাকা। স্মল বিজনেস লোন প্রোগ্রাম কর্মসূচিতে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই ঋণ দেয়া হয়। যেসব নারী বা পুরুষের ব্যবসায়িক দক্ষতা আছে কিন্তু পুঁজির অভাবে ব্যবসা করতে পারছে না তাদেরকে এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ দেয়া হয়। এখানে প্রাথমিক ঋণের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা। ২০০৩ পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে সদস্য সংখ্যা ৮০,৮৬২ জন এবং মো ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭,৯৪৯ মিলিয়ন। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৮৮ শতাংশ। স্মল বিজনেস প্রোগ্রামের চেয়ে যাদের ব্যবসা বড় তারা স্মল এন্টারপ্রাইজ লেন্ডিং প্রোগ্রামের ঋণ সুবিধা পায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ঋণের পরিমাণ ৩০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা। এক বছর, দেড় বছর বা দুই বছরে এই ঋণ পরিশোধযোগ্য। ২০০৩ সালে এই কর্মসূচিতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ২,৮৩৯ জন এবং প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ২৮৬ মিলিয়ন টাকা।[৩৪]

ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সব এনজিওর কাজের ধরন মোটামুটি একই রকম। প্রত্যেকেই উপকারভোগীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। প্রশিকা এবং গ্রামীণ ব্যাংক গৃহায়নের জন্য গৃহ ঋণ প্রদান করে। একটি দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি ঘর তৈরি সারা জীবনের স্বপ্ন। তাই এনজিওদের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দরিদ্রদের স্বপ্ন পূরণের উদ্যোগ বলে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক ভিক্ষুক পুনর্বাসন

[৩৪] Grameen Bank, *Annual Report*, 2004, p. 7-19.

ঋণ এবং গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে যা একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ।

খ. বীমা ও সঞ্চয়

ঋণের পাশাপাশি প্রতিটি এনজিও বীমা এবং সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রেখেছে। বীমার ক্ষেত্রে কোন কোন এনজিও কোন বীমা ফি নেয় না তবে সদস্যের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারকে নির্দিষ্ট টাকা দেয়। আবার কোন কোন এনজিও বীমার জন্য টাকা নেয়। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে একজন নারীকে প্রতি মাসে বা নির্দিষ্ট মেয়াদে কিছু টাকা জমা রাখতে হয়। বিপদকালীন সময়ে বা প্রয়োজনে সঞ্চয় তুলে কাজে লাগাতে পারে।

ব্র্যাকের একজন সদস্য মারা গেলে তার ঋণ মওকুফ করা হয় এবং ৫,০০০ টাকা তার উত্তরাধিকারী বা মনোনীত ব্যক্তিকে দেয়া হয়। আর কয়েক প্রকার সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রয়েছে- সাপ্তাহিক ব্যক্তগত সঞ্চয়, আবশ্যিক সঞ্চয়, চলতি হিসাব সঞ্চয় ইত্যাদি। প্রশিকাতেও সঞ্চয় ও বীমা সুবিধা রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকেও মৃত সদস্যের বাকি ঋণ মওকুফ করা হয়। তার পরিবার মৃত্যু পরবর্তী এককালীন টাকা পায়। আশার সদস্যদের বাকি ঋণ মওকুফ করা হয়। তার পরিবার মৃত্যু পরবর্তী এককালীন টাকা পায়। আশার সদস্যদের প্রতি হাজার ঋণে তিন টাকা হারে ঋণবীমা দিতে হয়। সদস্য মারা গেলে ঋণ মওকুফ করা হয়। আট বছর মেয়াদি জীবন বীমার প্রিমিয়াম সাপ্তাহিক ১০ টাকা। সদস্যদের মৃত্যু হলে তার পরিবারের সদস্যরা জমাকৃত টাকার ৬ গুণ টাকা ফেরত পাবে আর মৃত্যু না হলে সদস্য সমুদয় টাকা সুদসহ ফেরত পাবে। আর সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যত ইচ্ছা সঞ্চয়ের বিধান রয়েছে। তবে সঞ্চয় উত্তোলনের ক্ষেত্রে ঋণের ৫ শতাংশ রেখে বাকিটা উত্তোলন করা যাবে। দুর্যোগকালীন সময়ে সঞ্চয়ের পুরোটাই উত্তোলন করা যাবে।

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সব এনজিওর বিধান মোটামুটি একই রকম। সদস্যের মৃত্যু হলে সব এনজিও ঋণ মওকুফ করে এবং সদস্যের উত্তরাধিকারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক প্রদান করে। এই টাকার পরিমাণ এনজিও ভেদে একেক রকম। সঞ্চয়ের সুযোগ সব এনজিওতেই আছে। তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ একেক রকম। সদস্যরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয়ের একটা অংশ রেখে বাকিটা উত্তোলন করতে পারে।

৪.২.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এনজিওগুলো শুধু ক্ষুদ্রঋণের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি। উপকারভোগীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তারা ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে দরিদ্র নারীরা কর্মসংস্থান করতে পারে এবং গৃহীত ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এই কার্যক্রমের আওতায় এনজিওদের যে সব কর্মসূচি রয়েছে তা নীচে আলোচনা করা হলো:

ক. গবাদি পশু উন্নয়ন কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বিষয় রয়েছে। যেমন- গবাদি পশু উৎপাদন, হাঁস-মুরগি উৎপাদন, গবাদি পশু সহায়ক সেবা। ব্র্যাকের এই কর্মসূচিতে প্রায় ১.৯৬ মিলিয়ন সদস্য জড়িত। প্রশিকার এই কর্মসূচিতে নিম্ন পুঁজির প্রয়োজন হয় বলে দলীয় সদস্যদের কাছে এটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় কর্মী ও দলীয় সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ কোর্স এবং দলীয় সদস্যদের জন্য মোট ১৮টি কোর্স প্রস্তাব করা হয়। মোট ৫৩৩ জন কর্মী ও ৪৯৬ জন দলীয় সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যার মধ্যে ৯৩% ই নারী। এছাড়া ১৩,১২৫ জন টিকাদানকারীকে নিয়ে টিকাদান কর্মশালা করা হয়। ব্র্যাক ও প্রশিকার এসব দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে উপকারভোগীরা যে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয় তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে পারে, ফলে লাভ হয় অনেক বেশি। উপকারভোগীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দিলেও এইসব দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম তেমন করে না।

খ. মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি

মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের নদী-নালায় মাছের খুব অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে এদেশে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ শুরু হয়। এনজিওরা তাদের উপকারভোগীদের জন্য মৎস্য-উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের কাছে মৎস্য-জীবিকা একটি জনপ্রিয় জীবিকা হিসাবে গড়ে উঠেছে। এর ফলে নারীরা এই কাজে আগ্রহী হচ্ছে ও তাদের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ব্র্যাকের এই কর্মসূচি ১৯৭৬ সালে শুরু হয়। এ পর্যন্ত ২৩৪৪১২ জন চাষি ৪৭৪২৯ একর এলাকায় মৎস্য চাষে নিয়োজিত রয়েছে। প্রশিকা এই কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জেলেদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। এ বছর ৩৯৪০ জেলেকে বিভিন্ন প্রকল্পে ২৪৪৩৯৬৭০০

টাকা ঋণ প্রদান করে। ২০০১-২০০২ সালে প্রশিকার নারী দলীয় সদস্যদের মধ্যে পুকুরে মাছ চাষে ৬০ শতাংশ, নৌকা ও জাল তৈরিতে ৬১ শতাংশ, মাছ ধরায় ৭১ শতাংশ, মাছ নার্সারিতে ৭৫ শতাংশ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণে ৬৯ শতাংশ, সমন্বিত মাছ ফার্মিং-এ ৫৪ শতাংশ, জাল বোনা ৯৫ শতাংশ এবং মাছ ব্যবসায় ৬৪ শতাংশ নারী যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী এনজিওরা বিভিন্ন ট্রেনিং, কারিগরি সহায়তা দিয়েছে।

ব্র্যাক এবং প্রশিকাই মূলত উপকারভোগীদের জন্য মৎস্য-উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একটি বিপুল সংখ্যক নারী উপকারভোগী মৎস্য চাষের সাথে জড়িত হয়েছে যা এই ক্ষেত্রকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করছে।

গ. সামাজিক বনায়ন

পরিবেশ রক্ষার জন্য এনজিওগুলো সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি চালু করে। এর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে গাছ রোপণে উৎসাহিত করা, অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করা। এর কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। যথা- নার্সারি উন্নয়ন, গৃহ আঙিনায় বৃক্ষ রোপণ, প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপণ, প্রাকৃতিক বন রক্ষা ইত্যাদি। ব্র্যাকের এই কর্মসূচিতে ৭৩,৫০৮টি বনায়ন ফার্ম রয়েছে। প্রশিকা ২০০১-২০০২ সালে গৃহ আঙিনায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আওতায় ৩০,৩৩১টি গ্রুপের অংশগ্রহণে ২০,৫,১৯২টি গৃহ আঙিনা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি (Home stead plantation) চালু করে। ২৯২টি গ্রুপের তত্ত্বাবধানে নার্সারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৯২টি নার্সারি করা হয়। প্রতিটি বিভাগ মিলিয়ে ৩১, ৬৭১টি গ্রুপের অংশগ্রহণে ৪০৬ কি. মি. জমিতে সামাজিক বনায়ন করা হয়। নারীরা এই কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলেই নারীরা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির সাথে জড়িত। এনজিওরা তাদের নারী উপকারভোগীদের এই সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে। নার্সারি ছাড়াও গৃহাঙ্গনে বৃক্ষ রোপণ নারীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্র্যাক এবং প্রশিকা এই আয় বর্ধক কর্মসূচিতে নারীদের জড়িত করেছে।

ঘ. রেশম উন্নয়ন কর্মসূচি

রেশম উন্নয়ন কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এই কার্যক্রম দলীয় সদস্যদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় কার্যক্রম। এর মাধ্যমে দলীয় সদস্য, বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে।

মালবেরি গাছ রেশম চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই গাছ যত্ন, পাহারা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দলের নারী সদস্যদের দেয়া হয়। ব্র্যাকের বর্তমানে ৮টি সিল্ক সিড উৎপাদন কেন্দ্র, ৬টি রেশম রিসোর্স কেন্দ্র এবং ৩টি রিলিং কেন্দ্র রয়েছে। প্রশিকার ৭২টি মালবেরি প্রকল্প দেখাশোনার জন্য ৩৫৯ জন কেয়ারটেকার নিয়োগ দেয়া হয়। যেসব দলীয় সদস্য রেশম চাষের সাথে জড়িত তাদেরকে প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা ও বাজারজাতকরণের সুযোগ করে দেয়া হয়। এছাড়া প্রশিকা তার সদস্যদের জন্য মৌমাছি পালন কর্মসূচি, ইরিগেশন এবং টাইলিং প্রযুক্তি সেবা, কৃষি জমিতে ও বাড়িতে ইকোলজিক্যাল কৃষি কর্মসূচি ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

৪.২.১.৩ সচেতনতা বৃদ্ধি

অসচেতনতা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যা। অসচেতনতার কারণে তারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে সমস্যার আবর্তে তারা আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরতরে ডুবে যায়। ঐ দরিদ্র শ্রেণি আর কোনদিনই নিজের অবস্থার উন্নয়ন করতে সক্ষম হয় না। তাই এনজিওরা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। তারা মনে করে মানুষকে সচেতন করতে পারলে সে নিজেই তার ভাল-মন্দ বিচার করতে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এনজিওরা যে সকল কাজ করে তা আলোচনা আবশ্যক।

ক. সামাজিক সঞ্চালন

এনজিওরা বিশ্বাস করে, নারীদের প্রতি যে বৈষম্য ও নিষ্পেষণ রয়েছে তা হতে রক্ষা পাবার জন্য তাদের অবশ্যই আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। যখন দরিদ্র নারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্র্যাক থেকে উৎসাহিত করা হয় এবং নানান ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা হয়, যেমন- উকিল বা পুলিশের সাহায্য, আইনি সহায়তা ইত্যাদি।

খ. ইস্যু ভিত্তিক সভা

গ্রাম সংগঠন সদস্যরা মাসে একবার মিলিত হয়। এখানে সামাজিক অবিচার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন শিক্ষা, অধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নারী নিষ্পেষণ সংশি- ষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই মাসিক সভায় গ্রাম-সংগঠন সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। এই ফোরামটিকে কণ্ঠস্বর তোলার (Voice gaining) এবং বৃহত্তর ফোরামে অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ. পল্লিসমাজ

কয়েকটি গ্রাম সংগঠন থেকে প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে একটি পল্লিসমাজ গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সালে সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে এই উদ্যোগ নেয়া হয়। পল্লিসমাজের সবচেয়ে মজার দিক হলো, এর সব সদস্যই নারী। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ব্র্যাক গ্রাম সংগঠন সদস্যদের ১১,১১৪টি পল্লিসমাজ গঠনে সাহায্য করেছে। এই দলগুলো বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করছে, যেমন- বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দুর্নীতি, অবিচার ইত্যাদি। পল্লিসমাজ সদস্যরা সালিশের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন করে এবং বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে সক্রিয় লবিং করে থাকে। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থাকলেও তা তেমন কার্যকর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে না। এক্ষেত্রে এসব পল্লিসমাজ একটি চাপ সৃষ্টিকারী গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া সমাজে এনজিওর সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায়। এসব পল্লিসমাজ সদস্যরা সমাজে বসবাস করে বিধায় জনগণকে সচেতন করা তাদের জন্য সহজ হয় এবং মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করে।

ঘ. সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

সাংস্কৃতিক কর্মসূচি মানুষের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। তাই বিভিন্ন সময়ে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এনজিওরা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে থাকে। দরিদ্রদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সামাজিক ইস্যুকে সামনে তুলে ধরার জন্য ১৯৯৮ সালে ব্র্যাকের পপুলার থিয়েটার-এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক অসুস্থতা ও অবিচার এবং তার সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরা হয়। এছাড়া দরিদ্রদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান আইন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়। একই সাথে এই কার্যক্রম থিয়েটারে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গতানুগতিক জেন্ডার ভূমিকাকে ভেঙে দিয়েছে। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ২৫টি বিষয়ের উপর ১৩,৬৪৯টি শো প্রদর্শিত হয়েছে। এই মাধ্যমে ব্যবহার করে প্রশিকা মৌলবাদ দূরীকরণ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রক্ষা ও গণতন্ত্রের পক্ষে মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এর জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল গড়ে তোলা হয়েছে। ১০৫টি সাংস্কৃতিক দলে মোট ১৪৬৩টি গ্রাম ভিত্তিক অনুষ্ঠান করছে। এই কর্মসূচিতে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই মাধ্যম খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক

কর্মকান্ডের মাধ্যমে এনজিওরা দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে। ফলে মানুষ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে।

ঙ. মানবাধিকার এবং আইনি জ্ঞান

বাংলাদেশের মানুষের মানবাধিকার ও আইনি জ্ঞান খুব কম। সেখানে দরিদ্র নিরক্ষর জনগোষ্ঠী মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না। বিশেষ করে নারী সমাজে আইন না জানার কারণে নান ধরনের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন তাই এনজিওরা মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ১৯৮৬ সালে মাঝামাঝি এই কর্মসূচি চালু হয়। মনে করা হয়, আইন বিষয়ক সচেতনতা থাকলে গ্রাম সংগঠন সদস্যরা নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের বেআইনি, অন্যায্য এবং বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করতে পারবে। সাতটি বেসিক আইন এর উপর একটি ট্রেনিং কোর্সের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি চালু করা হয়। ট্রেনিং-এর বিষয়বস্তু হল- নাগরিক সুরক্ষা আইন, ক্রিমিন্যাল আইন, হিন্দু ও মুসলিম পারিবারিক আইন, হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, ভূমি আইন, শিশু ও নারী পাচার আইন এবং এসিড নিক্ষেপ আইন। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ২০,৬৯, ৩৭৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৮৬,৯২৩টি ট্রেনিং কোর্স সমাপন করা হয়েছে। মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কে জানার ফলে মানুষ সচেতন হয়।

চ. আইনি সহায়তা ক্লিনিক

বেশির ভাগ দ্বন্দ্ব ও সমস্যা স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। আবার কোন কোন সমস্যা আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়া সমাধান হয় না। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাধারণত ওইসব সেবার জন্য অর্থ জোগান দিতে পারে না। এ অবস্থায় ব্র্যাক 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' নামে একটি আইন সাহায্যকারী সংস্থাকে নিয়ে ১৯৯৮ সালে তার লিগ্যাল এইড কর্মসূচি চালু করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সদস্য বা সদস্য নয় এমন জনগোষ্ঠীকে লিগ্যাল ট্রেনিং বা সেবা প্রদান করা হয়। ২০০২ সালে লিগ্যাল এইড ক্লিনিকে ১১,১৭৫টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে ৩২৮৭টি কেস ট্রেইন্ড প্যারালিগ্যাল স্টাফদের দ্বারা সালিশের মাধ্যমে সমাধান হয়েছে এবং ২০৫৫টি কেস কোর্টে পাঠানো হয়েছে। ব্র্যাক তার সদস্যদের জন্য ১.৭ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায়ে সাহায্য করেছে। এই আইন সহায়তা ক্লিনিকগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা দিয়ে তাদের অধিকার আদায়ে সহায়তা করে থাকে। বিশেষ করে, তালাক, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ, ভরণপোষণ, সন্তানের পিতৃত্বের দাবি, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের নানান সমস্যা হয় কিন্তু এর জন্য দেশে প্রয়োজনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও তারা অর্থ ও সচেতনতার অভাবে এসব সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। এনজিওরা

নারীদেরকে এসব ক্ষেত্রে সহায়তা করার ফলে নারীরা উপকৃত হচ্ছে, পাশাপাশি সমাজের মানুষ সচেতন হচ্ছে।

ছ. সহায়ক যোগাযোগ উন্নয়ন কার্যক্রম

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অডিও-ভিজুয়াল যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু প্রশিকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছে তাই যোগাযোগ উন্নয়নে কাজ করছে।

জ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি কর্মসূচি

বাংলাদেশ দুর্যোগপীড়িত দেশ। প্রতি বছর এদেশে বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা রকম দুর্যোগ হয়ে থাকে। এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কম হয়, জানমাল নিরাপদ থাকে। ২০০২ সালে এই কর্মসূচির আওতায় টর্ণেডো, অগ্নিকান্ড, বোমাবাজি ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের শুকনো খাবার, চিকিৎসা সরঞ্জাম, শীতবস্ত্র এবং ঘর মেরামতের জন্য নগদ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সারা দেশে এবং ঢাকা শহরে এই সব সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্যে ২ মিলিয়নেরও বেশি টাকা প্রদান করে। প্রশিকা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য কর্মী এবং দলীয় সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন সেন্টার তৈরি, আগাম সংবাদের ভিত্তিতে লোকজনকে সাইক্লোন সেন্টারে বা নিরাপদে সরিয়ে আনা, খাবার প্রদান ইত্যাদি। সরকারের একার পক্ষে দুর্যোগ মোকাবিলায় এত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করছে বিধায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি কর্মসূচি ভাল হচ্ছে। এতে বাংলাদেশে দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলক কম হচ্ছে।

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায়, এনজিওরা উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, আইনি সহায়তা, সামাজিক অব্যবস্থা ও কুসংস্কার দূরীকরণ ইত্যাদি। সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে ব্র্যাক। এছাড়া

প্রশিকারও বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। তবে গ্রামীণ ব্যাংক এবং আশার এ ধরনের তেমন কোন উদ্যোগ নেই।

৪.২.১.৪ দক্ষতা বৃদ্ধি

উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এনজিওদের একটি প্রধান কাজ। দক্ষতা না থাকলে ঋণ নিয়ে উপকারভোগীরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারবে না, ফলে তাদের অবস্থার কোন উন্নয়ন ঘটবে না। এতে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই সব এনজিওই ঋণদানের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় এনজিওদের কার্যক্রমগুলো আলোচনা করা দরকার।

ক. বাস্তব দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২০০২ সাল পর্যন্ত এক মিলিয়নেরও বেশি লোককে প্রশিকা 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করেছে। গ্রুপ মেম্বারদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন আয় বর্ধক কাজের সাথে জড়িত, সুতরাং তাদেরকে ঐ প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য এই ট্রেনিং প্রদান করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদেরকে, কীভাবে স্থানীয় সম্ভাবনা শনাক্ত করা যায় এবং তা কাজে লাগানো যায় তা-ও শেখানো হয়।

খ. মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এখানে মানুষ বেশি কিন্তু তাদেরকে মানব-সম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি বলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়নি। যার ফলে এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এনজিওরা তাই মানব উন্নয়নে কাজ করছে।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে প্রশিকা তেত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নারীসহ আটচল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুই শত উননব্বই ব্যক্তিকে দুই লক্ষ উননব্বই হাজার নয় শত একুশটি মানব-উন্নয়ন ট্রেনিং প্রদান করেছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ মিলিয়ন লোক প্রশিকা থেকে মানব-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। মানব-উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের বিশেষণ ক্ষমতার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি এবং একই সাথে ম্যানেজমেন্ট এবং কর্ম পরিচালনার দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা হয়। একজন মানুষ তার মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। প্রশিকার উন্নয়ন

প্রক্রিয়ায় ট্রেনিং একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানব-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য দলীয় সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

মানিকগঞ্জের কৈট্টাতে প্রশিকার 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' রয়েছে। আনুষ্ঠানিক ট্রেনিংসমূহ এখানে প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং বগুড়ায় তিনটি 'আঞ্চলিক মানব-উন্নয়ন কেন্দ্র (ADC)। গ্রাম পর্যায়ে উপ-আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। দলে যে সাপ্তাহিক ট্রেনিং প্রদান করা হয় তাকে দল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বলা হয়। এখানে বিভিন্ন বিষয় যেমন- দারিদ্র্য-বিমোচন, সংগঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবেশ ও উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ইত্যাদির উপর ৪২টি সেশনে ছয়টি ট্রেনিং পরিচালনা করা হয়। এই ট্রেনিংগুলো সহজ পাঠ ও লেখা। গ্রুপ রিসোর্স পারসনগণ সহজ ভাষায় পরিচালনা করতে পারে। ফেডারেশনের সদস্য এবং দলীয় নেতাদের জন্য মানব-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় যেসব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকে তা হল- সমাজ-বিশেষণ এবং সংগঠন তৈরির কৌশল, উন্নয়ন এবং সংগঠন, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা, পিপলস থিয়েটার, নন-ফরমাল এডুকেশন, TOT কৌশল এবং পদ্ধতি, পরিবেশ এবং উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রশিকা টেকসই উন্নয়ন-কৌশল এবং দারিদ্র্য বিমোচন, ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট, পাটিসিপেটরি ট্রেনিং এর পদ্ধতি ও কৌশল, ব্যবস্থাপনায় নারী ইত্যাদি বিষয়ের উপর ট্রেনিং দেয়। ব্র্যাক, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক সমিতির সদস্যদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়।

এসব কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওরা দেশে মানব-উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। যাতে দেশে মানব সম্পদ তৈরি হয় এবং তা দেশের উন্নয়নে কাজ করে।

গ. কর্মশালা

কর্মশালার মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা তাদের সচেতনতার মাত্রা পরিমাপ করে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা হয়। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে যে ফলাফল উঠে আসে তা প্রশিকা ম্যানেজমেন্ট এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মশালার সংখ্যা ৭৯৩৬টি এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৫৩৭৬৪ জন। অন্যদিকে গ্রামভিত্তিক ওয়ার্কশপের সংখ্যা ১৬৮৭টি এবং অশংগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৯৩০০ জন। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব অভিজ্ঞতা হয় তা শেয়ার করা এবং যেসব সদস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা তুলে ধরা ও এর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রশিকা কর্মশালার আয়োজন করে।

উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় সব এনজিওই কাজ করে থাকে। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে সদস্যদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং আশাও তাদের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

৪.২.১.৫ সাংগঠনিক দক্ষতা

সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনজিওরা নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উপকারভোগীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি হলে তারা দলকে টিকিয়ে রাখতে পারবে। দলবদ্ধভাবে থাকলে নিজেদের অধিকার আদায় করা সহজ হয় এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এনজিও কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হল-

ক. গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-উন্নয়ন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য ব্র্যাক প্রতিষ্ঠান-উন্নয়ন কার্যক্রমকে একটি কৌশল হিসাবে নিয়ে আসে এবং এটার উপর জোর দেয়। এই গ্রাম সংগঠন দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সংগঠন, যারা ব্র্যাকের সহায়তায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন করছে এবং উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

ব্র্যাকের মূল যোগ্যতা (approach and competency) হল, একটা বড় পরিসরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে, প্রাথমিকভাবে নারীকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করা। ঐ সব সেবা প্রদান ও স্থানীয় দল গঠনে সহায়তা করার জন্য ব্র্যাক স্থানীয় নারীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে স্থানীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় সংগঠন তৈরিতে ব্র্যাকের সেবা প্রদান কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সারাদেশে ব্র্যাক তার ৩.৫৩ মিলিয়ন সদস্যকে ১১৩৭৫৬ গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করেছে। ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মী সপ্তাহে একদিন ঐ সংগঠনের সাথে মিলিত হয়ে লোন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সোশাল ডেভেলপমেন্ট কর্মী মাসে দু'বার মিলিত হয়ে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং আইন বিষয়ক আলোচনা করে। স্বাস্থ্য কর্মী মাসে একবার মিলিত হয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করে।

খ. প্রাথমিক দল গঠন

প্রাথমিক দল গঠন প্রশিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রশিকা নারী এবং পুরুষ উভয়কে নিয়েই কাজ করে তবে তার মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি। প্রশিকা বিশ্বাস করে, দারিদ্র্য বিমোচন বা টেকসই উন্নয়ন আলাদা বিষয় নয়। এখানে দরিদ্রদের দল গঠনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি যেমন, জেলে, তাঁতি ও পটুয়া। এছাড়াও বস্তিবাসী এবং উপরোক্ত পেশায় নিয়োজিত নারীদের নিয়ে প্রাথমিক দল গঠন করা হয়। মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ ক্ষমতায়নের এই প্রক্রিয়ায় প্রশিকার আর্থিক প্রকল্পের মাধ্যমে দলের সদস্যরা নিজেদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করছে। একই ধরনের ২০/২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে প্রাথমিক দল গঠন করা হয়। এ ধরনের দলকে 'সমিতি' বলে। ২০০১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ২০,৫৪৩টি প্রাথমিক দল গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৫,২০১টি নারী দল এবং ৫,৩৪২টি পুরুষ দল। এছাড়াও শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১,৪৮,৩৫৪টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ৯৪,০৭৩টি নারী দল এবং ৫৪,২৮১টি পুরুষ দল।

প্রশিকা বিশ্বাস করে, দারিদ্র্য-বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন একটি অপরটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই প্রশিকা সংগঠন তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। দরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র চাষি, বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন- জেলে, তাঁতি এবং পটুয়া, বস্তিবাসী এবং উপরোক্ত সব ধরনের নারীদের নিয়ে প্রাথমিক দল গঠন করা হয়। মানবিক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ট্রেনিংসহ ক্ষমতায়নের এই প্রক্রিয়ায় প্রশিকার আর্থিক প্রকল্পের আওতায় দলীয় সদস্যরা নিজেদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। বিশ থেকে পঁচিশ জন সমমনা বা একই পেশার লোকের সমন্বয়ে এই প্রাথমিক দল গঠন করা হয় এবং এই দলকে সমিতি বলে।

গ. গ্রুপ ফেডারেশন

প্রাথমিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে একই সাথে বস্তি এবং ওয়ার্ড পর্যায়েও গ্রুপ ফেডারেশন গঠন করা হয়। এই ফেডারেশন বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে দরিদ্রদের স্বার্থ রক্ষার কাজ করে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এভাবে তারা বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারি সম্পদ, সেবা ও প্রতিষ্ঠানে দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। এই গ্রুপ ফেডারেশনকে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, বস্তি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে যথাক্রমে- গ্রাম ফেডারেশন, ইউনিয়ন ফেডারেশন, উপজেলা ফেডারেশন, বস্তি ফেডারেশন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে এরিয়া ফেডারেশন বলে।

ঘ. স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃত্বের ওয়ার্কশপ

ব্র্যাক এরিয়া অফিস প্রতি তিন মাস অন্তর গ্রাম-সংগঠন সদস্য এবং কমিউনিটি লিডারদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এখানে স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং লিগ্যাল ইস্যু নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা হয়। স্থানীয় এলিট নেতৃত্বকে জনগণের কাছে আরও দায়বদ্ধ করার জন্য এই ওয়ার্কশপ এর নকশা বা ডিজাইন করা হয়েছে। এই ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণকারীরা হল- ইউ পি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় কাজী, ইমাম, শিক্ষক, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ২০০২ পর্যন্ত ৬৬০৬টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঙ. স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধি নির্বাচন

গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত করেছে। তারা প্রতি তিন বছর অন্তর গ্রামীণ ব্যাংক বোর্ড মেম্বার নির্বাচন করে। এই অভিজ্ঞতা তাদেরকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থায় অংশ নিতে সাহায্য করেছে। ২০০৬৩ সালে ৭৪৪২ জন গ্রামীণ ব্যাংক সদস্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৩০৫৯ জন জয়লাভ করে। ব্র্যাকের পল্লিসমাজ সদস্যরা স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অনেকেই ইউ পি সদস্য হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক এ তিনটি এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এসব এনজিও সদস্যদের নিয়ে প্রাথমিক দল গঠনের পাশাপাশি এসব দলের ফেডারেশন গঠন করে যাতে, এই দরিদ্র উপকারভোগীরা নিজেদের দাবি আদায় ও চাহিদা পূরণে সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে পারে। এনজিওর দরিদ্র উপকারভোগীদের মধ্য থেকে স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত হয়েছে যা সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয়েছে।

৪.২.১.৬ শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। একটি দেশের শিক্ষার হারের উপর সে দেশের প্রবৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সহজেই বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী নিরক্ষর, যাদের পক্ষে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সহজ নয়। বাংলাদেশে এনজিওদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিশু থেকে বয়স্ক সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। কার্যক্রমগুলো আলোচনা করা আবশ্যক।

ক. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানব উন্নয়নে এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই শিক্ষা কার্যক্রম মূলত যারা স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি অথবা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে, ওইসব শিশুদের তথা ৮-১০ বছরের শিশুদের জন্য পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে ৭০ শতাংশ বালিকাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। ব্র্যাকের প্রায় ২২০৮৫টি উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল পরিচালিত হয়। যার মধ্যে ২০৮৯৬টি গ্রাম এলাকায় অবস্থিত। প্রশিকা শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২০০৫৪টি উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ৬১৩৮৬২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। ঝরে পড়া শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণ করার জন্য এনজিওরা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। এসব শিশুরা সরকার নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে। যেমন- গান, বাজনা ইত্যাদি।

খ. বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অধিকার, মূল্যবোধ এবং দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে সচেতন হয়। এই বিষয়গুলো তাদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। ব্র্যাকের এই সব নতুন সাক্ষর দলীয় সদস্যরা সঞ্চয়, পাশ বই ইত্যাদি নিজেরাই হিসাব ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। প্রশিকার পুরুষ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের টার্গেট ছিল, ৪২১০টি এবং অর্জন হয়েছে ২১৬৩টি, যার শতকরা হার ৫১ শতাংশ। অন্যদিকে নারী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের টার্গেট ছিল ৯২৯০টি এবং অর্জন হয়েছে ৮৫৬২টি যার শতকরা হার ৯২ শতাংশ। এনজিওদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে বয়স্ক মানুষেরা হিসাব-নিকাশ থেকে শুরু করে চিঠিপত্র লেখাপড়ার যোগ্যতা অর্জন করে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অধিকার সচেতন হয়ে থাকে।

গ. হার্ড টু রিচ

কর্মজীবী শিশুদের জন্য এনজিওরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর ফলে দরিদ্র শিশুরা জীবিকার পাশাপাশি শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ব্র্যাক ১৯৯৭ সালে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট শহরের বিভিন্ন এলাকায় ২৮৫টি স্কুল খোলে। এরপর প্রতিবছর এটা বাড়তে থাকে। প্রশিকা হার্ড টু রিচ কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং সিলেট ডিভিশনের কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণে প্রশিকা প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিকর বিস্কুট বিতরণ করে। আইএলও-এর অর্থায়নে প্রশিকা বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসের কোর্সে

শিক্ষার্থী ভর্তি করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সুযোগ বঞ্চিত শিশুরা শিক্ষা লাভ করছে, তাদের প্রতিভার বিকাশ সাধন হচ্ছে।

অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষা, প্রাথমিক পরবর্তী মৌলিক শিক্ষা, গ্রামে গ্রামে গণ কেন্দ্র পাঠাগার, ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি, পাঠ কেন্দ্র, গার্মেন্টস শিশু শ্রমিকদের শিক্ষা, আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা ইত্যাদি।

ঘ. উচ্চ শিক্ষা ঋণ

বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারের অনেক মেধাবী সন্তান অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে সহায়তা করলে তারা সহজেই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৭ সাল থেকে এই উচ্চশিক্ষা ঋণ চালু করে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা মেধাবী তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য মায়েরা এই ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা মেডিকেল স্কুল, প্রকৌশল বিদ্যা, সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রি, কৃষি কলেজ, টেক্সটাইল ইনজিনিয়ারিং বা অন্য কোন উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হয়েছে তারা এই উচ্চশিক্ষা ঋণের আওতাভুক্ত হবে। একজন শিক্ষার্থীকে তার কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভর্তি ফি, কোর্স ফি, প্রয়োজনীয় খাতা-কলম, খাদ্য, বসবাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে ১৮৫৪ জন শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ পেয়েছে। এনজিওদের এই উচ্চশিক্ষা ঋণ দরিদ্র পরিবারের জন্য আশার আলো বয়ে নিয়ে এসেছে। এসব পরিবার থেকে একজন সন্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সেই পরিবার দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে।

ঙ. বৃত্তি

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা স্কুলে ভাল করছে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর বৃত্তি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়। স্কুলে বিভিন্ন পর্যায় পড়াশোনা করে প্রতিবছর এমন ৬০০০ এর বেশি ছেলেমেয়েকে এই বৃত্তি দেয়া হয়। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৩৪৩ জন ছেলেমেয়ে এই বৃত্তি পেয়েছে।

এনজিওরা শিক্ষা কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, হার্ড টু রিচ, বিভিন্ন রকম বৃত্তি ইত্যাদি। ব্র্যাক ও প্রশিকা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে স্কুল থেকে ঝরে পড়া বালিকা শিশুদের প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিক্ষক হিসাবে স্থানীয় বিবাহিত নারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। কর্মজীবী শিশুদের জন্য হার্ড টু রিচ শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। এতে কাজের পাশাপাশি শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা ঋণ এবং স্কুলে যারা ভাল ফলে করে তাদেরকে বৃত্তি দিয়ে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলেছে এবং বিভিন্ন অনুদান দিয়ে শিশুদেরকে স্কুলে ধরে রাখতে চাইছে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য এই সুযোগ যথেষ্ট না হওয়ায় তাদেরকে কাজে পাঠায়। এনজিওরা কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারের সহায়ক হিসাবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

৪.২.১.৭ স্বাস্থ্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে স্বাস্থ্য সেবা থেকে দূরে অবস্থান করছে। সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত না হলে কোন কাজই ভালভাবে করা সম্ভব নয়। এছাড়া ঔষধপত্র ও ডাক্তারের পিছনে খরচ করতে করতে গরিব মানুষের সব টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায়। তাই এনজিওরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে, যা আলোচনা করা হলো-

ক. স্বাস্থ্য বিষয়ক অবকাঠামো তৈরি

নিরাপদ পানি, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ও গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অতীব প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রেণির জন্য এই সুবিধাদি অপ্রতুল। ফলে তারা নানান ধরনের অসুখ-বিসুখে ভোগে। উন্নত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে এই সমস্যাগুলো থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মুক্ত থাকতে পারে। ব্র্যাক পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এর সাথে যৌথভাবে ১৯৯৯ সাল থেকে আর্সেনিক মিটিগেশনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিকা তাদের দলীয় সদস্যদের তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই সুবিধাদি প্রদান করেছে। পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, গৃহে পানি পরিশোধন ফিল্টার প্রদান, আর্সেনিক নিরোধ প-ান্ট তৈরি করে থাকে। আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের জন্য আটটি আর্সেনিক নিরোধ প-ান্ট ও সাতটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-ান্ট স্থাপন করা

হয়। পাশাপাশি ৬২৩৪টি গৃহ ফিল্টার প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সর্বমোট ১৪১১৪৮টি স্যানিটারি পায়খানা এবং ৭৬টি স্যানিটারি উৎপাদন প্রকল্প চালু করা হয়। এছাড়া ১৪৪৬৮টি টিউবওয়েল-এ আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়। এনজিওদের এসব উদ্যোগের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী একটা সুস্থ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্যানিটেশনের আওতায় আসতে পারছে। বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছে। এর ফলে অসুখ-বিসুখ কমে এসেছে, মানুষ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারছে।

খ. স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম

ভগ্ন স্বাস্থ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে বাধাস্বরূপ। বাংলাদেশের জনগণের অধিকাংশই গরিব, আর তারাই স্বাস্থ্য সেবা ও সুযোগের বাইরে রয়ে গেছে। প্রশিকা তার এই কর্মসূচিতে 'প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম' এই শিক্ষা দানের মাধ্যমে সুযোগ-বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য বিষয়ক দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করছে। ২০০১-২০০২ সাল পর্যন্ত ১২৯ জন উন্নয়ন শিক্ষা কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৮৩ জন নারী। ৬২২৫৯৪ জন দলীয় সদস্যদের জন্য ১২৬০৫৬টি দল ভিত্তিক 'স্বাস্থ্য ও পুষ্টি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ধাত্রী প্রশিক্ষণ, অক্ষম ব্যক্তিদের উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে সহায়তা করা প্রভৃতি প্রশিকার এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত।

গ. প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা

ব্র্যাক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য সদস্যদের স্যানিটারি রিং ল্যাট্রিন কেনার টাকা প্রদান করে। বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য সেবিকারা ঘরে ঘরে দম্পতিদের কাছে যায়। ৩৯৫০০৫টি দম্পতি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। শিশুদের টিকা প্রদানের জন্য সেবিকারা তথ্য এবং সেন্টার সম্পর্কে জানায়। ২৩৯৩২১ জন ১ বছরের শিশুদের টিকা প্রদান করা হয় এবং ২৮৩৭৫৯ জন নারীকে টিটি টিকা প্রদান করা হয়। গ্রামীণ গর্ভবতী নারীদের গর্ভকালীন সেবা দেয়া হয়। এক বছরে ৩১২৩৮২ জন নারী প্রসব পূর্ববর্তী সেবা এবং ১৯৯৯৭৯ জন নারী প্রসব পরবর্তী সেবা পান। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এছাড়া ব্র্যাকের সুস্বাস্থ্য নামক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, এইডস কর্মসূচি করেছে। ঢাকা ও রংপুরে আশা দুটি স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। জটিল রোগে আক্রান্ত সদস্যদের বিনামূল্যে অবস্থানসহ চিকিৎসা করানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও এ ধরনের চিকিৎসা অনুদান হিসাবে আশা কোন চাঁদা বা প্রিমিয়াম ছাড়াই এককালীন অনুদান দিয়ে থাকে। সদস্যদের বড় ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি

যেমন- ক্যান্সার, এসিডদগ্ধ, হার্ট অপারেশন, মেরুদন্ড অপারেশন, ব্রেইন টিউমার, প্যারালাইসিস, অর্থোপেডিক চিকিৎসা, স্টোন অপারেশন, কিডনি ট্রান্সপ-ান্ট প্রভৃতির জন্য অনুদান দেয়া হয়। এসব অসুস্থতার জন্য ২০০৫ সালে থোক বরাদ্দকৃত ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট হতে সদস্যদের অনুদান দেয়া হয়েছে।

সদস্যদের অন্যান্য ব্যাধি যেমন, চোখের ছানি অপারেশন, যে কোন ছোট খাট হাড়ের অপারেশন বা চিকিৎসা, ব্রেস্ট ক্যান্সার, জরায়ু অপারেশন ও সিজারিয়ান অপারেশনের ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ওয়ারী বরাদ্দের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হতে সংশি- ষ্ট সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান করা হয়। যে কোন দুর্ঘটনাজনিত কিংবা অন্যান্য বড় ধরনের শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার জন্য এক মাস বা এক মাসের বেশি সময় যদি কোন সদস্য হাসপাতালে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে 'চিকিৎসা অনুদান তহবিল' থেকে চিকিৎসা ব্যয় প্রদান করা হয়। আশা সদস্য ও তাদের পরিবারের মাঝে কিছু ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়। বৎসরের নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজনীয় ঔষধ- খাবার স্যালাইন, প্যারসিটামল ট্যাবলেট, আমাশয় ও ডায়রিয়ার ঔষধ, রক্ত স্বল্পতার ও দুর্বলতার জন্য আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল, কৃমিনাশক বড়ি ইত্যাদি প্রদান করা হয়। তবে সদস্যদের স্বামী বা পরিবারের সদস্যরা কেউ ধূমপায়ী হলে তাকে ঔষধ দেয়া হয় না।

এনজিওরা দরিদ্র উপকারভোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মূলত ব্র্যাক এবং প্রশিকা উপকারভোগীদের জন্য বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। আর্সেনিক নিরোধ, স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান, বিশুদ্ধ পানির জন্য ফিল্টার প্রদান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গর্ভবতী মায়েদের সেবা প্রদান, প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, শিশু টিকা প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া এসব এনজিওর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে উপকারভোগীরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণি তাদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে পারে। আবার আশা সারাদেশে তাদের সদস্যদেরকে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দিতে না পারলেও বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য এককালীন অনুদান দিয়ে থাকে যা সদস্যদের উন্নত চিকিৎসার জন্য সহায়ক। এছাড়া আশা বিভিন্ন সময়ে সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করে থাকে।

৪.২.১.৮ জেন্ডার

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

নারী উন্নয়ন প্রশিকার প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূলত প্রশিকা প্রথম থেকেই দল গঠন করছে এবং এ পর্যন্ত অর্ধ-মিলিয়নের বেশি নারী দল আছে। মোট ঋণ সুবিধার ৬০ শতাংশ নারী দল পরিচালিত প্রকল্পে ব্যয়িত হয়। প্রশিকা বিশ্বাস করে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। প্রশিকা দেখেছে যেসব কাঠামো এবং বিশ্বাসের কারণে তারা অন্যের পদানত হয়ে থাকছে সেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন করতে হবে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৯৪০৭৩টি নারী দল গঠন করা হয়েছে এবং ২০০১-২০০২ সালে ১৫২০১টি দল গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিমাপের জন্য প্রশিকার জেন্ডার সমন্বয়ক সেল, ব্র্যাকের জেন্ডার ইউনিট এবং গ্রামীণ ব্যাংক ও আশার জেন্ডার সেল রয়েছে।

ক. জেন্ডার সেল ও জেন্ডার ইউনিটের কার্যক্রম

প্রশিকার জেন্ডার সম্পর্ক সমন্বয়ক সেলের সদস্যরা ২০০১-২০০২ সালে ৭৫১টি প্রাথমিক দল এবং ১০১টি দলীয় ফেডারেশন পরিদর্শন করে। এ বছর এই সেল যৌতুক, বাল্যবিবাহ, সম্পদে নারীর প্রবেশের সুযোগ, আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রবেশাধিকার, শিশু শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পরিবারে নারী-নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র বিশে- ষণ করে। নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য ২০০১-২০০২ সালে ১৬টি ওয়ার্কশপ করেছে তার মধ্যে ৮টি গ্রাম ফেডারেশন এবং ৮টি উপজেলা ফেডারেশনকে নিয়ে। ব্র্যাকের জেন্ডার ইউনিট, গ্রামীণ ব্যাংক ও আশার জেন্ডার সেল বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রকল্পের জেন্ডার সচেতনতা কার্যক্রম দেখাশোনা করে।

জেন্ডার বিষয়টি এনজিওদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া। তবে জেন্ডার বিষয়টি এককভাবে কোন প্রকল্প নয় বরং প্রতিটি প্রকল্পের মধ্যে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে প্রতিটি উপকারভোগী জেন্ডার সচেতন হয়। এভাবে জেন্ডার সচেতন হয়ে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হচ্ছে, পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছে ফলে তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হচ্ছে।

৪.২.১.৯ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রতিটি এনজিও তাদের পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হচ্ছে কি না তা জানার জন্য পরিবীক্ষণ-এর ব্যবস্থা রাখে। এতে করে কার্যক্রম যদি তার সঠিক পথ থেকে ছিটকে

পড়ে তাহলে তাকে নতুন করে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়। পরিবীক্ষণের মাধ্যমেই মূলত কর্মসূচির সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি গৃহীত কর্মসূচির ফলে জনগণ বিশেষ করে উপকারভোগীদের উপর কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে দেখা হয়। এর জন্য সার্ভে করা হয়, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেখার জন্য গবেষণা করা হয়।[৩৫]

উপরে আলোচিত চারটি এনজিও- ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক ও আশা বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কাজ করছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র শ্রেণি বিশেষ করে নারীদের কাছে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। যার ফলে উপকারভোগীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারছে। তারা ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, নার্সারি তৈরি, রেশম চাষ, বনায়ন ইত্যাদি কাজে জড়িত হয়ে নিজের ও পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উপকারভোগীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় এবং সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তারা বেশি আয় করতে পারে।

৪.২.২ নারী উপকারভোগী সংশি- ষ্ট জাতীয় পর্যায়ের এনজিওদের কার্যক্রম

এনজিওদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র নারীদের উন্নয়ন। তবে বেশিরভাগ এনজিও দরিদ্র নারীর পাশাপাশি দরিদ্র পুরুষদের জন্যও কাজ করে থাকে। এর মধ্যে কিছু এনজিও আছে যারা শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে কাজ করে। নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য এই এনজিওগুলো উৎসর্গীকৃত।

৪.২.২.১ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ বা বিএনপিএস মূলত নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে থাকে। বিএনপিএস মনে করে শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীর উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা ক্ষমতায়ন সহ নারীর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে। সংস্থার নারী উন্নয়ন কার্যক্রম জানতে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

---

[৩৫] BRAC, *Annual Report*, Dhaka, 2004, p. 1-42; PROSHIKA, *Annual Report*, 2004, p. 1-90; Grameen Bank, *Annual Report*, 2004, p. 7-19; ASA, *Annual Report*, 2003, p. 2-22; Muhammad Yunus, *Ibid*, p. 8&17.

৪.২.২.১.১ সামাজিক ক্ষমতায়ন

সামাজিক ক্ষমতায়ন নারীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় না হলে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় না। তাই এনজিওরা নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। নারীকে অধিকার সচেতন করা, সামাজিক ইস্যুতে দাবি আদায়ে সোচ্চার করা, রাজনৈতিক শিক্ষা, আইনি সহায়তার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করে থাকে ।

ক. প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building)

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের অন্যতম কার্যক্রম হল প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building)। এর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে ছোট ছোট দল ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ফেডারেশন গঠন করা হয়। এইসব দলে নিয়মিত সভা পরিচালিত হয়। বিএনপিএস-এর এই প্রকল্পটি অধিকার-ভিত্তিক প্রকল্প হিসাবে কাজ করে। দলীয় সদস্য ও নেতৃত্বকে তাদের নাগরিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার রক্ষায় সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এরা মানবাধিকার ভিত্তিক সামাজিক সঞ্চালন, বস্তি উচ্ছেদ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। তৃণমূল পর্যায়ের নারী নেতৃত্ব কমিউনিটি ভিত্তিক এডভোকেসির সাথেও যুক্ত। বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিষয়টি দলীয় সদস্যদের জানানো হয় এবং পরবর্তীতে লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে কাজ করা হবে তা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ইউনিয়ন বা এরিয়া নেতৃত্ব সমস্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক পরামর্শ নিয়ে সুষ্ঠুভাবে দল চালাতে সহায়তা করে। এছাড়াও এসব নারী নেতৃত্ব স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারি সেবা আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। বিএনপিএস-এর কর্ম এলাকায় এসব দল আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে সরকারি কর্মকর্তারাও যোগ দিয়ে থাকেন।

খ. শিক্ষার উন্নয়ন

বিএনপিএস তার কর্মসূচির অংশীদারদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষা (Political education) কার্যক্রম চালু করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের বিশে- ষণ ক্ষমতা বাড়ানো এবং সামাজিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। এই কর্মসূচিতে দলীয় সভায় তৃণমূল কর্মীরা বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে। এর পাশাপাশি নেতৃত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের উপর এরিয়া নেতৃত্ব ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই রাজনৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের

ক্ষেত্রে তৃণমূল ও দরিদ্র নারীদের কিছুটা হলেও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নারী নেতৃত্ব বিভিন্ন ট্রেনিং-এর মাধ্যমে নেতৃত্বে দক্ষতা অর্জন করে এবং নারীর অধিকার রক্ষায় নেতৃত্ব দিতে পারে।

গ. আইনি সহায়তা

বিএনপিএস-এর আইন সহায়তা কেন্দ্রের প্রথম উদ্দেশ্য হল নারী অধিকার রক্ষা ও নারীদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে দলীয় সদস্যদেরকে আইন শিক্ষা, দরিদ্র নারীদেরকে আইনগত সহায়তা দেয়া, বিভিন্ন আইনি বিষয়ের উপর কর্মশালা, পলিসি বা নীতির উপর গবেষণা ইত্যাদি করা হয়।

ঘ. শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা

এই সংগঠন তাদের কার্য এলাকায় ২০টি শিশু ও কিশোরী কার্যক্রমের আওতায় উপানুষ্ঠানিক (Non Formal) স্কুল চালু করেছে। এখানে গ্রুপ সদস্যদের সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এই সব স্কুলের শিক্ষার্থীরা সহজেই তাদের যোগ্যতার প্রমাণ করে প্রতি বছর অন্যান্য স্কুলে উপরের ক্লাসে ভর্তির সুযোগ পায়। অন্যদিকে এইসব স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হারও খুব কম। প্রতিটি সেন্টারের স্কুলের শিক্ষকদের জন্য রয়েছে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এছাড়া অভিভাবক ও পিতা-মাতাদেরকে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের জন্য উৎসাহিত করা হয় যাতে অভিভাবকরা গুনগত মান উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে।

ঙ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়ন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে যেসব সমস্যা হয় তা নিরসনে কাজ করাই এই কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। দুর্যোগ প্রতিরোধে দল গঠন, বৃক্ষরোপণে উৎসাহিতকরণ, দুর্যোগ চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রতিষ্ঠান একটি সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। দুস্থ নারীরা একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজেই অধিকার আদায় করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে। রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হয় এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধন হয়। এনজিও থেকে আইনি সহায়তা নিয়ে সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

৪.২.২.১.২ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

বিএনপিএস বিশ্বাস করে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি প্রধান বিষয়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দলীয় সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশের ভূমহীন দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহণের তেমন সুযোগ নেই। অন্যদিকে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিলে উচ্চ হারে সুদ দিতে হয়। তাই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এই সংগঠন সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা, আইজিএ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ক. সঞ্চয় সৃষ্টি

দলীয় সদস্যরা তাদের সঞ্চয় ফান্ডে প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করে জমা দেয়। এছাড়া সদস্যরা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করতে পারে। সঞ্চয়ের মূলত কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে-

প্রথমত, দলীয় সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা;

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা;

তৃতীয়ত, ধীরে ধীরে বাহ্যিক তহবিলের প্রতি নির্ভরতা কমানো।

খ. ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা

১৯৮৭ সাল থেকে বিএনপিএস দলীয় সদস্যদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। দল গঠিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। এই ঋণ শুধুমাত্র দলভুক্ত নিম্ন আয়ের নারীদেরকে উৎপাদনশীল খাতে বিশেষ করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য দেয়া হয়। ছোট ছোট কিস্তিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।

গ. আইজিএ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

যেসব দলীয় সদস্য ঋণ গ্রহণে আগ্রহী তাদের জন্য তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উৎপাদনশীল কাজ নির্ধারণ ও সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য এই প্রশিক্ষণে সহায়তা করা হয়। তাছাড়া ঋণকে কীভাবে সফলভাবে ব্যবহার করা যায় তাও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখানো হয়।

ঘ. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দলভুক্ত নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ব-ক, বাটিক, গৃহ-আঙিনায় সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে কৌশলগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এনজিওরা সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকলে অন্য কোনো ক্ষমতায়ন সুদূরপরাহত, তাই এনজিওরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নেও কাজ কাজ করছে।

৪.২.২.১.৩ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিএনপিএস- এর একটি অন্যতম বিষয়। এই সংগঠন মনে করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল-গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন, নারীদের প্রতি স্থানীয় সরকারকে অধিকতর কার্যকরী ও দায়িত্বশীল করা, রাজনৈতিক দলগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উন্নয়ন। নীচে কার্যক্রম আলোচনা করা আবশ্যক।

ক. স্থানীয় সরকার ও সুশাসন

বিএনপিএস স্থানীয় সরকারের সাথে কাজ করে। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সাথে কাজ করার ফলে ওইসব জনগণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সেবা পাবার জন্য এবং একই সাথে স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা, বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার কাঠামোরও সঠিকভাবে সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। মূলত সুশাসন নিশ্চিত হলেই জনগণের প্রতি স্থানীয় সরকারের দায়বদ্ধতা বাড়বে। স্থানীয় সরকারের সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যেসব কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে তা হল-

- স্টাফ ও অংশীদার সংগঠনের কর্মীদেরকে জেন্ডার উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জন্য প্রশিক্ষণ;
- বিভিন্ন লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি ছাপানো;
- জেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
- কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

- গণতন্ত্র সচেতনতা সেশন পরিচালনা।

খ. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

১৯৯০ সাল থেকেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিএনপিএস রাজনৈতিক বিষয়ে বা ক্ষেত্রে কাজ শুরু করে। এই সংগঠন জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। বিএনপিএস মনে করে, তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহত রাখলে তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও চর্চা হবে। এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ হল-

- নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে কাজ করা;
- নারী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের রাজনীতি ও নির্বাচনে ভয়হীন পরিবেশ তৈরি করা;
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন বিকাশে সহায়তা করা।

গ. নির্বাচন সংস্কার

বিভিন্ন নির্বাচনে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু নয়। যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর এখানে অভিযোগ তোলার সুযোগ রয়েছে। ফলে এই প্রক্রিয়া জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও প্রশ্নাতীত করা উচিত। এসব ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা দূর করতে পারলে তা প্রার্থী ও ভোটার উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার অন্য একটি সমস্যা দুর্বলতর অংশ বিশেষ করে নারী, ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য কোনো ছাড় দেয়া হয়নি। এইসব ত্রুটি দূর করার জন্য এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।

ঘ. অ্যাডভোকেসি ও লবিং

নারীর জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল ও ভয়মুক্ত নীতি প্রণয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান ও কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যাডভোকেসি ও লবিং করা হয়। এর জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এবং এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি ও লবিং করা হয়। এদের অন্যতম অ্যাডভোকেসি ইস্যুগুলো হল-

- জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
- নির্বাচন প্রক্রিয়া সংস্কার ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কাজ করা;

- নারীর জন্য জাতীয় সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধি;
- ফতোয়া ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা নারী নির্যাতন বন্ধে কাজ করা;
- শিক্ষানীতির সংস্কার এবং এটাকে অসাম্প্রদায়িক ও জেন্ডার বান্ধব করা।

ঙ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এর প্রধান উদ্দেশ্য হল কমিউনিটি বিশেষ করে দলীয় সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি। এর ফলে এলাকার জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে এবং যুবসমাজ এসবের সাথে জড়িত থাকার ফলে সমাজবিরোধী কাজে জড়িত হতে পারে না।

চ. বিতর্ক

বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন বিএনপিএস-এর অংশীদারদের নিকট খুবই পছন্দনীয় উদ্যোগ। এর প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী, পিতামাতা, শিক্ষক এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের মধ্যে জেন্ডার, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক ইস্যুতে সচেতনতা বাড়ানো।

ছ. সহায়ক কর্মসূচি

এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় এনজিওদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পলিসি রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন এবং প্রকাশনা।

এনজিওরা মনে করে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হলে দেশের গণতন্ত্র সুসংহত হবে। এদেশের তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান করার জন্য স্থানীয় সরকার কাজ করছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সত্যিকার অর্থে জনগণের জন্য যথেষ্ট সেবা প্রদান করা হয় না। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং তার মধ্যে নারীরা আরও সেবা বঞ্চিত। অথচ এই সেবা পাওয়া তাদের অধিকার। এনজিওরা দরিদ্র নারীদেরকে বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করে তুলছে যাতে তারা সচেতন হয় এবং অধিকার আদায় করতে পারে।

৪.২.২.২ বাংলাদেশে উইমেন্স হেলথ্ কোয়ালিশন

স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি। সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই এনজিওরা জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে। সুস্বাস্থ্য বজায় থাকলে মানুষের অসুখ-বিসুখ কম হয়। কাজের স্পৃহা বাড়ে, টাকা পয়সা খরচ কম হয়। এছাড়া মরণ ব্যাধি এইডস থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের

প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে। কিশোর-কিশোরীদের বিদ্যালয় ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে।

৪.২.২.২.১ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার আওতায় যে সব কার্যক্রম রয়েছে তা আলোচনা করা হলো-

ক. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য কার্যক্রম

এই কর্মসূচির আওতায় সাতটি স্থানে ক্লিনিক্যাল সেবা দেয়া হয়। পাশাপাশি শহর অঞ্চলেও এই সেবা কার্যক্রম রয়েছে। মূলত এই কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় প্রান্তিক নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

খ. ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Satellite Health Centers)

প্রতিটি মূল ক্লিনিকের অধীনে ৩টি ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এগুলো ৩টি ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত। এসব ক্লিনিক এলাকার স্বাস্থ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ২০০৪ সালে ১৮,৯০৭ জন গ্রাহক এই ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। বর্ষা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেবা গ্রহীতারা যখন মূল কেন্দ্রে আসতে পারে না তখন ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রগুলো সন্তোষজনক সেবা প্রদান করে।

গ. কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা বা বিদ্যালয় ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা

এই সংগঠনের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ প্রাধান্য দেয়া হয় কিশোর-কিশোরীদের প্রতি। এর জন্য সংগঠনের একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচি রয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো সেবা কেন্দ্র ও কমিউনিটি বেজড অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে করা হয়। বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন-এর তালিকাভুক্ত স্কুলে ক্লিনিকের পক্ষ থেকে পনেরো দিনে একদিন সেবা প্রদান করা হয়।

ঘ. ধাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি

'বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন'-এর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪০ জন ধাত্রী কাজ করে। তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ধাত্রীদের দায়িত্ব হচ্ছে-গর্ভবতী মায়েদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদেরকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুষম খাদ্য গ্রহণ, পুষ্টি, টিকা, প্রসব কালীন যত্ন, প্রসব

পরবর্তী যত্ন এবং নবজাতকের ভাল মন্দ সম্পর্কে মায়েদেরকে জানানো। এছাড়া ধাত্রীরা প্রসবকালীন সময়ে মায়েদেরকে সাহায্য করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রসূতি মায়েদের চিহ্নিত করে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়া। ২০০৪ সালে এসব ধাত্রীদের সহায়তায় ৩,৮৭৬টি প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

ঙ. শহুরে দরিদ্র বস্তিবাসী এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য কার্যক্রম

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে শহরের নারীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর জন্য কাজ করে। এ কর্মসূচির আওতায় কিছু বিশেষ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-

১. জরুরি প্রসূতি সেবার জন্য ব-াড ব্যাংক;
২. প্রসব কেন্দ্র;
৩. স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি।

চ. নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য যত্ন প্রকল্প

এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল- নগরের দরিদ্র শ্রেণির স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন ঘটানো। এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে গর্ভকালীন যত্ন, স্বাভাবিক প্রসব, সিজারিয়ান প্রসব, প্রসব পরবর্তী যত্ন, ঋতু নিয়মিতকরণ সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, ডায়রিয়া চিকিৎসা, ওজন পরিবীক্ষণসহ বিভিন্ন জরুরি চিকিৎসা সেবা।

এর আওতায় যেসব কর্মসূচি রয়েছে তা হল-

১. কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য যত্ন প্রকল্প

কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এটি শিশু কেন্দ্রিক কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প। এখানে শিশুর সাথে তার পরিবারও উন্নয়নের আওতাভূক্ত হয়।

২. ক্লিনিক্যাল সেবা

ঢাকার মোহাম্মদপুরে মূল ক্লিনিক এবং ৫টি ভ্রাম্যমাণ/অস্থায়ী ক্লিনিকের মাধ্যমে বস্তি এলাকায় সেবা দেয়া হয়। এর ফলে উপকারভোগীরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবা পায়।

৩. স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রম

স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া হয় ও চেক-আপ করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মূল ও ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকে যায়। শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর TOT(Training Of

Trainers) দেয়া হয়, যাতে তারা ওইসব বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারেন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পিতামাতদেরকেও বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

৪. পথ শিশুদের জন্য কার্যক্রম

বিনামূল্যে পথশিশুদেরকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। ২০০৪ সাল থেকে প্রায় ১,২০০ পথ শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৫. গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য কার্যক্রম

মোহাম্মদপুর থানার অধীনে ৮টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৪.২.২.২.২ এইডস ও যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কিত কার্যক্রম

১৯৯৫ সালে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় একই সাথে এইডস এর উচ্চ ও নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের নিয়ে কাজ করা হয়। এর জন্য দুটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। একটি নারায়ণগঞ্জ এবং অন্যটি ঢাকার যাত্রাবাড়িতে। গ্রামাঞ্চলে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে এই সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া ক্লিনিক ও কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি জোড়ায় শিখণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো হয়। এই কর্মসূচির আওতায় যেসব কার্যক্রম রয়েছে তা হল-

১. হোটেল ভিত্তিক যৌনকর্মী কার্যক্রম

এই কর্মসূচি ২০০৩ সালে গৃহীত হয়। দেখা গেছে যে, ভাসমান ও যৌনালয় থেকে হোটেল ভিত্তিক যৌনকর্মীদের গ্রাহক (Client) সংখ্যা বেশি। ফলে এই জনগোষ্ঠী এইডস এর জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৭০ জন সাইট কর্মী, ৩৫ জন peer educator, এবং হোটেল ম্যানেজমেন্ট কমিটি পেশাগতভাবে এই কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত। ঢাকা শহরে ৩টি ড্রপ-ইন সেন্টারের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়। এর আওতায় যেসব কার্যক্রম রয়েছে তা হল- যৌন কর্মীদের সাথে যোগাযোগ, ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ, হোটেল কর্মীদের এসব রোগ সম্পর্কে নিয়মিত অবহিতকরণ, অ্যাডভোকেসি সভা, পুরুষ ও নারী কনডম বণ্টন, পুরুষ ক্লায়েন্ট-এর জন্য লিফলেট বিতরণ ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

২. এইচ আই ভি/ এইডস প্রতিরোধক কার্যক্রম (যৌনপল্লী ভিত্তিক কার্যক্রম)

এই প্যাকেজের আওতায় ৮টি যৌনপল্লীতে কাজ করা হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, দৌলতদিয়া, ফরিদপুর (২), মাদারীপুর, টাঙ্গাইল এবং পটুয়াখালী যৌনালয়ে কাজ করে। এখানে বিভিন্ন যৌনরোগের উপর পরামর্শ প্রদান, এইচ আই ভি/ এইডস, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে।

উপরোক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওরা নগর জীবনের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে ভয়ংকর এইডস-এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এর জন্য যৌনপল্লী ভিত্তিক ও হোটেল ভিত্তিক কর্মসূচি চালিয়ে থাকে। এইডস-এর মত ভয়ংকর ব্যাধি সাধারণত এসব যৌনকর্মীদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে থাকে। তাই এসব যৌনবাহিত রোগ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ রাখার জন্য এনজিওদের এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে।

৪.২.২.২.৩ কমিউনিটি সার্ভিস

জনগণের আচরণের পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যগত আচরণের উন্নতির জন্য সময় প্রয়োজন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল, জনগণকে তথ্য এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত করা, যাতে তারা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারে ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় এবং উন্নয়নের মূল ধারায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

কমিউনিটি ভিত্তিক সার্ভিসের প্রধান কার্যক্রমগুলো হল-

১. বয়স্ক নারীদের ছোট ছোট দল তৈরি করে 'আচরণিক পরিবর্তনের' উপর পাঠ/সেশন পরিচালনা করা;
২. এলাকার উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো;
৩. গৃহ পর্যায়ে নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করা ও পরামর্শ প্রদান;
৪. স্কুল ও কমিউনিটিতে কিশোর-কিশোরী প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৫. কমিউনিটির জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য সামাজিক সঞ্চালন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.২.২.২.৪ কিশোর-কিশোরী বান্ধব রিসোর্স সেন্টার (ক্লাব, লাইব্রেরি)

কিশোর-কিশোরীদের মন-মানসিকতা ভাল রাখার জন্য এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৪টি রিসোর্স সেন্টার কাজ করে। এখনও

যার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব রিসোর্স সেন্টারে কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন শিখনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং একই সাথে বিভিন্ন শিখন সহায়ক উপাদান থাকে।

৪.২.২.২.৫ সামাজিক সঞ্চালন কার্যক্রম

সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে থাকে। এছাড়া রয়েছে সরকার, বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি সহায়ক দলের সদস্য, কিশোর-কিশোরী প্রভৃতির সাথে সভা সমিতি করা এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে সচেতন করা।

৪.২.২.২.৬ কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় নারীকেন্দ্র

কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় একটি কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়, যেখানে কিশোরীসহ বিভিন্ন বয়সের নারীরা মিলিত হয়। তারা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে এবং সেসব সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও তাদের নিজস্ব দুঃখ-কষ্ট-আনন্দসহ বিভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করে।

৪.২.২.২.৭ অ্যাডভোকেসি ও অধিকার

'বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন'- এর অন্যতম কর্মসূচি হল অ্যাডভোকেসি ও অধিকার নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা। এর আওতায় কতগুলো কার্যক্রম রয়েছে, তা হল-

ক. বৃদ্ধাদের স্বাস্থ্য কার্যক্রম

বয়স্ক নারীদের সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হয়। তাদের দল গঠন করা হয় এবং নিয়মিত দলীয় সভা করা হয়। ঐ দলীয় সদস্যদেরকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। ওইসব সদস্যদের পরিবারে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন সহায়ক সেবা দেয়া হয়। যেমন- নিরাপদ পানি সরবরাহ, বিভিন্ন পরামর্শ ইত্যাদি।

খ. নারী স্বাস্থ্য অধিকার

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃত্ব সেবা এবং কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা হয়। স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ প্রকৃত প্রশাসনিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে।

গ. নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য জেন্ডার সচেতন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে নারীকে ক্ষমতায়িত করা এবং এ কাজে পুরুষকেও সম্পৃক্ত করা যাতে পরিবার ও সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর পাশাপাশি এই প্রকল্পের অন্যতম কাজ জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ। যতদিন পর্যন্ত নারীরা তাদের পূর্ণ দক্ষতাকে কাজে লাগাতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। এই প্রকল্প দুটি কেন্দ্র পরিচালনা করে। একটি নড়াইলের লোহাগড়ায় অন্যটি টাঙ্গাইলে।

৪.২.২.২.৮ দুর্যোগ : জরুরি ত্রাণ ও ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও 'বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন' কাজ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসব কাজ করেছে তা হল-

ক. বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

২০০৪ সালে ৩০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী বন্যায় আক্রান্ত হয়। বন্যার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 'বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন'-এর কর্মীরা একদিনের বেতন প্রদান করেন এবং এই টাকায় ১৩৬৫টি বন্যার্ত পরিবারের জন্য খাবার কেনা হয়। এছাড়া নেদারল্যান্ডের সহায়তায় আরো ১০০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয় এবং ২০০০ পরিবারের ৫ বছরের শিশুদের মধ্যে গুড়োদুধ বিতরণ করা হয়।

খ. জরুরি চিকিৎসা সহায়তা

বন্যার জন্য নানা ধরনের রোগ বালাই যেমন-ডায়রিয়া, সাপের কামড়, নিউমোনিয়া, পানিতে ডোবা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। 'বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন'-এর পক্ষ থেকে ৩৩৭০ খাবার স্যালাইন বণ্টন করা হয়। এসব এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

'বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন' শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের জন্যও সেবা প্রদান করে থাকে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্কুল ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ফলে তারা নিয়মিত চিকিৎসার আওতায় থাকতে পারছে। এছাড়া সামাজিক সঞ্চালন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এইডস্সহ যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধে কাজ করে যা পুরো জাতিকে নিরাপদ রাখার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বৃদ্ধ মানুষেরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলিত। তাদের স্বাস্থ্যসেবা ও আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে। কমিউনিটি পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মাতৃ মৃত্যুর হার কম রাখে। এছাড়া দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি চিকিৎসা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়ে বিপন্ন মানুষকে বাঁচতে সহায়তা করে।

৪.২.২.৩ নারী উদ্যোগ কেন্দ্র

নারী উদ্যোগ কেন্দ্র 'নউক' একটি বেসরকারি নারী উন্নয়ন সহায়ক সংগঠন। এই সংগঠন ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'নউক' জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও নারীর সমানাধিকার রক্ষায় কাজ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অভাব, সহিংসতা এবং নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীরা অনগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও সমাজের নেতৃত্ব, পরিবার ও জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, পলিসি উন্নয়ন এবং লক্ষিত কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে সেভাবে তাদের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের কার্যক্রমসমূহ নীচে আলোচনা করা আবশ্যক

৪.২.২.৩.১ নারী শ্রমিকদের জন্য সমন্বিত সেবা

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প থেকে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। আর এখানে যেসব শ্রমিক কাজ করে তার মধ্যে সিংহভাগ নারী। এত পরিশ্রম করলেও নারী শ্রমিকেরা খুবই অবহেলিত এবং অধিকার বঞ্চিত। ১৯৯১ সাল থেকে নারী উদ্যোগ কেন্দ্র বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। প্রথম থেকেই তারা এসব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সমস্যাকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। ১৯৮৪ সাল থেকে এদেশের গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বর্তমানে ৩৬৯৬টি ফ্যাক্টরিতে প্রায় ২ মিলিয়ন শ্রমিক উৎপাদন কাজে জড়িত। এর মধ্যে নারী ৮০ শতাংশ। এসব নারী শ্রমিকরা অশিক্ষা, অদক্ষতা ও অন্যান্য কারণে উদ্বৃত্ত শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে যে কোন সময় ছাটাই হয়ে

যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরকম অসম পরিবেশে থাকা সত্ত্বও এসব শ্রমিকেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং জীবনযাত্রার একটি মান তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টস শিল্পের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ব বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার হারিয়েছে। ফলে অন্যান্য দেশের সাথে খুবই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিপণন করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটা অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে। তাই 'নউক' শ্রমিকদের জীবনযাপন ও নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলো হল- কর্মীদের অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন, কর্মীদের অধিকার শিক্ষা ও শ্রমিক সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি, অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন, কর্মীদের বাসস্থান সংক্রান্ত সেবা, কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, গবেষণা, নথিভুক্তকরণ ও প্রকাশনা ইত্যাদি।

নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সচেতন করার পাশাপাশি মালিক পক্ষকে নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রদানের ব্যাপারেও সচেতন করে থাকে। এর ফলে নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ সুগম হয়। নারী শ্রমিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, কিন্তু সময় মত বেতন পায় না, ওভার টাইম ঠিক মত পায় না, সুপারভাইজার বা পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে খারাপ ব্যবস্থা ও কটূক্তি শুনতে হয়। এসব সমস্যা মোকাবিলায় 'নউক' সাহায্য করে। শ্রমিক সংগঠন তৈরি ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। এছাড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সমস্যার সমাধানে কাজ করে, যাতে তারা সুস্থভাবে কাজ করতে পারে।

৪.২.২.৩.২ স্থানীয় নারী এনজিওদের (উন্নয়ন সংগঠন) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্কিং

স্থানীয় নারী এনজিওদের মধ্যে জেন্ডার ও মানবাধিকার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা 'নউক' এর একটি অন্যতম লক্ষ্য। 'নউক' উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই নেটওয়ার্ককে মূলধারায় সমন্বিত করতে চাচ্ছে। স্থানীয় নারী এনজিওগুলো ১৯৮৪ সাল থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে এবং কার্যক্রম শুরু করে। জুন ২০০৪ পর্যন্ত প্রায় ৭৫০০ নারী সংগঠন এই অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রেশন পায়। এই সকল সংগঠনকে যথাযথভাবে সহায়তার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তেমন প্রস্তুতি ছিল না, কিন্তু এই সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক এবং নেতৃত্বের উন্নয়নের জন্য কৌশলগত সহায়তা প্রদান প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে নারীদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য সম্পদেও তাদের প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। তখন নারী উদ্যোগ কেন্দ্র এসব এনজিওর উন্নয়নের লক্ষ্যে

কাজ করতে শুরু করে। বর্তমানে 'নউক' ৬৪টি জেলায় ৮৮৬টি স্থানীয় নারী সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রতিটি জেলায় উন্নয়ন ফোরাম এবং স্থানীয় নারী 'এনজিও'-দের কোয়ালিশন গঠন করেছে।

এর মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে তা হল- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশের জন্য কৌশলগত সহায়তা, স্থানীয় নারী সংগঠনের নেটওয়ার্ক তৈরি ও অ্যাডভোকেসি, নারী এনজিওদের জাতীয় কোয়ালিশন, মানবাধিকার অ্যাডভোকেসি, দক্ষতা তৈরি এবং আন্দোলন, স্থানীয় নারী সংগঠনগুলোর বার্ষিক সম্মেলন, নারী এনজিওদের নিউজ লেটার ইত্যাদি।

'নউক' বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন সংগঠনদের নিয়ে কাজ করে। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নারী সংগঠনগুলো নারী উন্নয়নে কাজ করছে, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকায় এক সংগঠন কোন কাজ করলেও অন্য সংগঠনগুলো তার সুফল ভোগ করতে পারছে না। এছাড়া অনেক সময় একই জায়গায় একের অধিক সংগঠন একই উপকারভোগীদের নিয়ে কাজ করছে, ফলে সব কিছুর অপচয় হচ্ছে। নারী উদ্যোগ কেন্দ্র এই সমন্বয়ের ফলে এই ধরনের অপচয় রোধ করে বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে।

৪.২.২.৩.৩ নারী শিক্ষা প্রসারে সহায়তা কার্যক্রম

নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়া এবং গ্রামীণ বালক-বালিকাদের জন্য গৃহীত সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমকে সহায়তা করাই 'নউক'এর এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। 'নউক' ১৯৯২ সাল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে জেন্ডার অসমতা দুর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সাভার এবং ক্রমে কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া এবং নরসিংদীতে এই কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। এই কার্যক্রমে যেসব সেবা দেয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, ভর্তি ও পরীক্ষা ফি প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। এছাড়া শিক্ষক, পিতা-মাতা ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্যও জেন্ডার কর্মশালা করা হয়। এছাড়া 'নউক' ঢাকা এবং ময়মনসিংহে গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল এর ব্যবস্থা করে।

এই প্রকল্পের প্রধান বিষয়গুলো হল-

ক. প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার ও মানবাধিকার প্রশিক্ষণ, শিক্ষক, পিতামাতা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, জেন্ডার এবং মানবাধিকার-এর উপর প্রশিক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচনে ছেলেমেয়েদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।

খ. শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কিং ও অ্যাডভোকেসি

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে শিক্ষার্থী ফোরাম গঠন।

গ. মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা

মেয়েদের শিক্ষা সহায়তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকদেরকে পরামর্শ প্রদান, নারী শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি সঞ্চালন, যৌন-নির্যাতনের শিকার নারীদেরকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা ইত্যাদি।

নারী শিক্ষার প্রসারে 'নউক' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্কুলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জেন্ডার সচেতন করে। এর ফলে, তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব পড়ে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে গঠিত ফোরাম সহিংসতা রোধে কাজ করছে।

৪.২.২.৩.৪ স্থানীয় সরকার উন্নয়ন

বাংলাদেশে দুই ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিরাজমান- গ্রামীণ ও শহর কেন্দ্রিক। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহরে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন। ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম সংরক্ষিত আসনে নারী ইউ পি সদস্য হিসেবে সরাসরি নির্বাচিত হয়। এরপর ১৯৯৮ সালে পৌরসভায় ও ২০০২ সালে সিটি কর্পোরেশনে নারী কমিশনার নির্বাচিত হয়।

এই প্রকল্পে যেসব উদ্যোগ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

ক. স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং ও অংশীদারিত্ব

এর মধ্যে রয়েছে ইউ পি নারী প্রতিনিধি ফোরাম গঠন, পৌরসভা নারী প্রতিনিধি ফোরাম গঠন, সিটি কর্পোরেশনের নারী প্রতিনিধিদের জাতীয় ফোরাম গঠন ইত্যাদি।

খ. প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জেন্ডার এবং মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ. জেন্ডারকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি।

৪.২.২.৩.৫ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পরিবার উন্নয়ন

এই প্রকল্পের প্রধানতম উদ্দেশ্য হল নারীদেরকে অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি। এখানে স্ব-কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে একটি পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়েরই আয়ের ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে 'নউক' গ্রামীণ নারীদেরকে স্ব-কর্ম সংস্থান, নেতৃত্ব, জেন্ডার ও মানবাধিকার, সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও মাতৃত্ব অধিকার, আয় বৃদ্ধি মূল কার্যক্রম এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর ফলে পরিবারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

৪.২.২.৩.৬ সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার উন্নয়ন

এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'নউক' স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। জাপানি দূতাবাসের সহায়তায় ২০০০ সালে পাকুন্দিয়া থানার এগারোসিন্দুর ইউনিয়নে একটি কমিউনিটি হাসপাতাল তৈরি করে 'নউক'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে থানার সকল জনগণকে স্বাস্থ্য যত্ন ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল মৃত্যুহার কমিয়ে আনা। এর জন্য রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টিহীনতা দুর এবং পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এই প্রকল্পের সকল কর্মকান্ডে জেন্ডার প্রেক্ষিত বিবেচনা করা হয়।

হাসপাতালে দু'জন পূর্ণকালীন ডাক্তার (একজন পুরুষ ও একজন নারী), প্রশিক্ষিত ধাত্রী, সেবিকা, রেডিওগ্রাফার, মেডিকেল টেক্‌নোলজিস্ট, ডেন্টিস্ট ও একদল স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছে। এখানে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য যত্ন, প্যাথোলজি সেবা, ছোট খাট সার্জারি, বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, স্যাটেলাইট ক্লিনিক,

স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন, স্কুল স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য যত্ন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।

৪.২.২.৩.৭ জেন্ডার গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ

'নউক' সংগঠনকে জেন্ডার সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নীতি ও পরিকল্পনা পর্যায়ে জেন্ডারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এছাড়া এর জেন্ডার প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে- সাংগঠনিক পর্যালোচনা, পরিচিতি কোর্স, টি ও টি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি। পাশাপাশি অংশীদার এনজিওদের জন্য জেন্ডার পরিকল্পনা করে।

মোটামুটিভাবে নারী উদ্যোগ কেন্দ্র নারীদের কল্যাণে কাজ করছে। আজকে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে অর্থাৎ জেন্ডার সমতা আনয়নের জন্য এনজিওরা কাজ করে। বিশেষ করে নারীদের জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নারী শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে। এছাড়া একটি কমিউনিটি হাসপাতালের মাধ্যমে এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে।

৪.২.২.৪ দুর্জয় নারী সংঘ

এই সংগঠন মূলত যৌনপল্লী ও ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। যৌনকর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই সংগঠন কাজ করে।

কার্যক্রমসমূহ:

এই সংগঠনের জন্ম বেশি দিন নয়। ফলে কার্যক্রম সীমিত। বর্তমানে যেসব কার্যক্রম রয়েছে তা হল-

১. এই সংগঠন যৌনকর্মীদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে;
২. ড্রপ-ইন-সেন্টারের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিক, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সভার কার্যক্রম পরিচালনা করে;
৩. সামাজিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা শুরু করেছে। এর মাধ্যমে ভাসমান যৌনকর্মীদের মাঝে কনডম বিক্রি করা হয়;
৪. দুর্জয় অন্যান্য যৌনকর্মী সংগঠনের মধ্যে একটি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে;

৫. দুর্জয়ের সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সভায় অংশ নেয়;

৬. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রভৃতি উদ্‌যাপন করে থাকে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেয়;

৭. দুর্জয় নারী মাদকাসক্তদের নিয়েও প্রকল্প পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে 'আপন' মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কেয়ার বাংলাদেশ;

৮. দুর্জয়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে রয়েছে 'নাট্য দল'। যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে জনসচেতনতামূলক নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে;

৯. এই সংগঠন দাতাদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যৌনকর্মীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে থাকে;

১০. এই সংগঠনের কর্মীরা যৌনকর্মীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখে থাকে;

১১. কেয়ার বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের জন্য 'চাইল্ড কেয়ার প্রকল্পের' কাজ করছে;

১২. কেয়ার বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় এইচ আই ভি/ এইডস প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ করছে।

দুর্জয় নারী সংঘ মূলত দেশের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও ঘৃণিত শ্রেণিকে নিয়ে কাজ করে। এই যৌনকর্মীরা কখনই সমাজের বা উন্নয়নের স্রোতে আসার সুযোগ পায় না। তাই যৌনকর্মীদের মধ্যে এনজিওদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসারযোগ্য। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে কিন্তু সুযোগ পেলে এসব নারীরা অন্য কোন সম্মানজনক পেশায় যেতে পারে। এনজিওরা তাদেরকে সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়। এছাড়া তাদের সার্বিক উন্নয়নে এনজিওরা অবদান রাখে।[৩৬]

৪.৩ এনজিও কার্যক্রমের সম্ভাবনা

[৩৬] Bangladesh Nari Progoti Sangha, *Annual Report*, 2004, p. 5-22; Bangladesh Nari Uddog Kendra, *Annual Report*, 2004, p. 8-30; Bangladesh Women's Health Coalition, *Bulletin*, 2005, p. 1-4; দুর্জয় নারী সংঘ, *বুলেটিন*, ২০০৫, পৃ: ১-৪।

বাংলাদেশে এনজিওদের কার্যক্রম একটি অমিত সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। এদেশের খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে এনজিও। সেই প্রাচীন কাল থেকেই নারী ছিল গৃহের অন্তরালে। তাদের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোনো কিছুই ছিল না। আর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা বলে কোনো কিছু তারা চিন্তাই করতে পারতো না। ধনী বা দরিদ্র পরিবারের নারীদের অবস্থান প্রায়ই কাছাকাছি ছিল। তারা শুধু ঘরে কাজ করতো ও ছেলেমেয়ে পালন করতো। এর বাইরে তাদের কোনো জগৎ ছিল না। এর ফলে একটা বিরাট মানবসম্পদ উৎপাদনের বাইরে থেকে যাচ্ছিল।

স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশে এনজিও কার্যক্রম শুরু হয়। যুদ্ধপীড়িত দেশে ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধক কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল দুস্থ ও অবহেলিত নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার এনজিও কাজ করছে এবং দারিদ্র্য বিমোচন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরন্তর ভূমিকা রেখে চলছে।

এদেশে কৃষিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় অন্য কাজের সুযোগ কম। তার উপর নারীদের জন্য এই সুযোগ আরও অপ্রতুল। ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইলেও এদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষের ঋণ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। সেখানে এনজিওরা দরিদ্র নারীদেরকে ক্ষুদ্রঋণের আওতায় নিয়ে এসেছে। এই ঋণ নিয়ে দরিদ্র ও ভূমিহীন নারী ও তার পরিবারের সদস্যরা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে পেরেছে। এভাবে পরিবার তথা সমাজ দারিদ্র্য মুক্ত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের সাথে বীমা ও সঞ্চয়ের সুবিধা রয়েছে। উপকাভোগী সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে একটা নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ের জন্য জমা রাখছে যা তার প্রয়োজনে একসাথে তুলতে পারছে ও কাজে লাগাতে পারছে। এই টাকার জন্য তার কোনো সুদ দিতে হচ্ছে না। বীমা সুবিধা থাকায় কোনো সদস্য মারা গেলে তার অপরিশোধিত ঋণের টাকা মওকুফ করা হয়, পাশাপাশি তার মনোনীত উত্তরাধিকারীকে বীমার টাকা দেয়া হয়। এ উদ্যোগগুলো নিঃসন্দেহে মহৎ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপকারী। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি এনজিওগুলো বড় ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। যারা অনেক টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে চায় বা ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে যারা ব্যবসা বড় করতে চায় তারা এনজিও থেকে মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের জন্য এ সুযোগ এনজিও ছাড়া আর কোথাও থেকে পাওয়া অকল্পনীয়। আর এ ধরনের সুযোগ না পেলে কখনই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব নয়।

এনজিওরা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেনি। তারা সদস্যদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধক কর্মসূচির সুযোগ তৈরি করেছে। সদস্যদের মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রেণু সরবরাহ করা হয়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন হলে এনজিও থেকে সদস্যদেরকে সেই সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে মাছ চাষ একটি লাভজনক আয় বর্ধক কর্মসূচি হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। সদস্যরা বিশেষ করে নারীরা সামাজিক বনায়নের সাথে জড়িত। সদস্যরা ফার্ম গড়ে তোলে এবং এক্ষেত্রেও এনজিও থেকে বীজ প্রদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফার্মগুলোতে চারা তৈরি করে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছে। এতে পুঁজি কম লাগে কিন্তু শ্রম দিলে এটা লাভজনক ব্যবসা হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। এছাড়া এনজিও পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করে তুলছে। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রতিটি দরিদ্র পরিবারেই গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে তবে তা লাভজনক হয় না। এনজিওদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তার ফলে তারা এসব কাজে জড়িত হয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারছে। রেশম চাষের সাথে এনজিওরা তাদের উপকারভোগীদের জড়িত করে তাদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করছে। বলা যায় এনজিওদের সাথে সম্পৃক্ততার ফলেই নারীরা তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা বয়ে আনতে পারছে যা আর কোনো ভাবেই সম্ভব হত না।

বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার বিরাজ করে। এছাড়া অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে তারা নানান প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়। এ অবস্থায় এনজিওরা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী-নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করছে ফলে সমাজ থেকে এসব অপসংস্কৃতি আস্তে আস্তে দূর হচ্ছে। এছাড়া নির্যাতিত দরিদ্র নারীদের জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এনজিওরা মূলত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে।

বিচ্ছিন্নভাবে কোনো মানুষ ভাল কিছু করতে পারে না। তাদেরকে সংগঠিত ভাবে কাজ করতে হয়। মানুষ সংগঠিত হলে তাদের সমন্বিত উদ্যোগ অনেক বড় সম্ভাবনার জন্ম দেয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিদিনের খাবার জোটাতে যেখানে হিমশিম খায় সেখানে সংগঠনের চিন্তা বা উদ্যোগ তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এনজিওরাই নারীদেরকে প্রথম দলভুক্ত করেছে এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে

তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে তুলেছে। এর ফলে এখন আর দরিদ্র অসহায় মানুষকে আগের মত বঞ্চিত হতে হচ্ছে না।

এনজিওরা উপকারভোগীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তুলছে। পাশাপাশি সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে। ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাতৃত্ব ও শিশু যত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ প্রভৃতি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। এসব প্রশিক্ষণ অর্জনের ফলে দরিদ্র নারীরা ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে ও সমাজে ভূমিকা রাখতে পারছে। জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পরিবারে ও সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। ফলে পরিবারে নারীদের আর আগের মত অবহেলিত জীবন যাপন করতে হচ্ছে না। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাতৃত্বজনিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বুঝতে পারছে, ফলে মাতৃ মৃত্যু কমে আসছে। শিশুদের অসুখ বিসুখ ও তার লক্ষণ সম্পর্কে জেনে সচেতন হয়। এতে শিশুদেরকে মারাত্মক শিশুরোগের হাতে থেকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। নেতৃত্বের বিকাশের ফলে নারীরা নেতৃত্বে আসতে পারছে এবং সংগঠন চালাতে পারছে।

বাংলাদেশের সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এনজিওগুলো সরকারের সহায়ক হিসাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা, কর্মজীবী শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, বয়স্কশিক্ষা, নারী শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে এনজিওরা শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষার সুযোগ পেয়ে অবহেলিত ও সুযোগ বঞ্চিত শিশু ও নারীরা নিরক্ষরতা মুক্ত হতে পারছে। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এনজিওগুলো ভূমিকা রাখছে।

প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খুবই অপ্রতুল। এদেশে ধনীরা অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্যসেবা ক্রয় করতে পরলেও দরিদ্রদের পক্ষে সেই সেবা পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। এনজিওরা দরিদ্র শ্রেণির স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। স্যানিটেশন সুবিধা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প, গৃহ ফিল্টার প্রদান, শিশু ও মাতৃত্ব সেবা, প্রসূতি সেবা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, স্কুল ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, এইডস বিষয়ক সেবা, যৌনকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার শত ভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করেছে। এর পিছনে এনজিওদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দরিদ্র মানুষের পক্ষে

স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া বা এর সুফল সম্পর্কে জানা সহজ নয়। এনজিওরাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্যানিটেশনের সুফল সম্পর্কে জানিয়েছে এবং স্যানিটেশন টয়লেট সামগ্রী বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করেছে। তাদের আচরণিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্যানিটেশন নিশ্চিত করেছে। তাই এদেশে আজ শত ভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আর্সেনিক সমস্যা দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বিরাট সমস্যা। সেসব এলাকায় বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করে মানুষের জীবন বাঁচায় এনজিওরা। এনজিওদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ফলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার কমেছে। স্কুল ভিত্তিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কুলে বসেই স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। এছাড়া কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন কিছু সমস্যা থাকে তা সমাধানে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এর ফলে নানা ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাত থেকে কিশোরীরা বেঁচে যায়। কমিউনিটি সেবার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের লোককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। বয়স্ক নারীরা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হয়। তাদের আচরণিক পরিবর্তনসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, এনজিওদের স্বাস্থ্যসেবা না থাকলে এদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ স্বাস্থ্যসেবার বাইরে থেকে যেত।

নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এনজিওরাই প্রথম নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে। তার আগে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগ ছিল না। নারীর ক্ষমতায়ন না হলে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে কোনো কিছুতেই নারীর কথা বলার সুযোগ বা অধিকার থাকে না। এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়েও এনজিওরা কাজ করে। নারী নিজের পছন্দ মত প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে এবং পরিবার বা অন্য কোনো প্রভাবশালীর দ্বারা প্রভাবিত হবে না-এই লক্ষ্যে এনজিওরা কাজ করে। এনজিওরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ হিসাবে কাজ করে। জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে উপকারভোগী নারীদেরকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার জন্য প্রস্তুত করে তোলার ফলে তারা স্থানীয় সাকারে নির্বাচিত হচ্ছে এবং সেসব জায়গা থেকে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ এনজিওদের অবদান।

যৌনকর্মীদের মত নিপীড়িত শ্রেণিকে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এভাবে সহায়তা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এসব অন্ধকার জগতের অনেক নারীই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে এবং সমাজে পুনর্বাসিত হচ্ছে। এগুলো শুধুমাত্র এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

অন্যদিকে এনজিওরা নারী কর্মীদের অধিক হারে নিয়োগ প্রদান করে ফলে উপকারভোগী নারীদের সাথে কাজ করা সহজ হয়েছে। নারীরা নারীদের সমস্যা সহজে বুঝতে পারে এবং সমাধান করতে পারে। তাই নারী কর্মীদের সুবিধাদি নিয়েও এনজিওরা সচেতন থাকে। নারী যাতে কাজ করার সুন্দর পরিবেশ পায় এর জন্য এনজিওরা জেন্ডার পলিসি তৈরি করে সকল কর্মীদের একটি শৃঙ্খলার মধ্যে রাখে।

৪.৪ এনজিও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

এনজিওরা নারী উন্নয়নে এত কাজ করলেও নারীর সত্যিকারের কতখানি উন্নয়ন হয়েছে তা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশে- ষণ করে দেখা দরকার। সেই সত্তরের দশক থেকে এনজিওরা এদেশে কাজ করছে। তার পরেও দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি। নারীরা এনজিওর সাথে জড়িত হলেও তারা কতখানি আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন হয়েছে তা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এনজিওরা যেহেতু নারীদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে তাই তাদের স্বামীরা বাধ্য হয় স্ত্রীদের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করতে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই ঐ ঋণ গ্রহণকারী নারী তার পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা জানতেও পারে না ঋণের টাকা কীভাবে খরচ হল। এর ফলে নারীকে স্বাবলম্বী করার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এনজিওরা ঋণ প্রদান করা শুরু করেছিল তা অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। আর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নেয় কিন্তু তা সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে না পারায় তাদের সত্যিকারের উন্নতি হয় না, ফলে দরিদ্ররা তাদের অবস্থান তেমন কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। এনজিওরা ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করলেও সমাজ এখনও মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত হয়নি। এনজিওদের নিয়ম-কানুন মেনে টাকা প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক সময় মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে এই সুদের ঘানি টানতে গিয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন।

এছাড়া এনজিওদের সমন্বয়হীনতার কারণে একই স্থানে এক সাথে বিভিন্ন এনজিও একই উপকারভোগীদের নিয়ে কাজ করে। ফলে দেখা যায় উপকারভোগীরা একাধিক এনজিওর সাথে জড়িত হয়, ঋণ নেয়, দলীয় সদস্য হিসাবে নাম লেখায়। এতে দেখা যায় একাধিক এনজিও থেকে প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে অধিকাংশ সময় সঠিক পরিকল্পনা করে কাজে লাগাতে পারে না। অনেকে এক এনজিও থেকে ঋণ

নিয়ে অন্য এনজিওর ঋণ পরিশোধ করে আর বাকি টাকা খরচ করে ফেলে। এতে উপকারভোগীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। এছাড়া বিভিন্ন এনজিওর বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে জড়িত হতে গিয়ে তারা কোনো কাজই ঠিক মত শিখতে পারে না, ফলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এনজিওরা দরিদ্র নারীদের কাজের সুযোগ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মসূচি যেমন মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, রেশম চাষ ইত্যাদি হাতে নিলেও খুব কম উপকারভোগীই এসব কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনা করতে পারে। কেননা এসব বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা এইসব অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনগণের পক্ষে আত্মস্থ করা সহজ নয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ খুব স্বল্পমেয়াদি হওয়ায় তাদের পক্ষে বিষয়গুলো পুরোপুরি বোঝা সহজ হয় না। ফলে এইসব কার্যক্রম সকল উপকারভোগীর খুব একটা লাভ বয়ে আনে না। এছাড়া যারা ভাল উৎপাদন করে তারাও বাজারজাত করার অভাবে পুঁজি তুলে আনতে পারে না ফলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে উপকারভোগী নারীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এনজিওরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এর মাধ্যমে নারী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন-জেন্ডার সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিশু যত্ন, শিশুরোগ ইত্যাদি পেয়ে সচেতন হচ্ছে। তবে সব ক্ষেত্রে সেই সচেতনতার প্রয়োগ ঘটাতে পারছে না। এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ও আয়ক্ষম নারীরাই যেখানে তাদের পরিবারে সমঅধিকার পায় না সেখানে দরিদ্র পরিবারের নারীদের সমঅধিকার অর্জন করা কতটা দুরূহ তা সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে এনজিওরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

এনজিওরা নারীকে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে থাকে। তারা মনে করে নারী স্বাবলম্বী হলে পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নারীর ভিতরের সত্তা জাগ্রত হবে এবং তারা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পাশাপাশি পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে সাধারণত পুরুষ। তার ইচ্ছাতেই পরিবারে কেনাকাটা থেকে শুরু করে ছেলেমেয়ের বিয়ে সব কিছু হয়। সেখানে কিছু কিছু পরিবারে নারীর মতামত নেয়া হলেও বেশির ভাগ পরিবারে নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। আর এনজিওরা এখানে তাদের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সত্যিকার পরিবর্তন আনতে পারেনি।

সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনজিওরা নারীদেরকে সংগঠনের আওতায় এনে বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করে। একক প্রচেষ্টায় অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না, অধিকার আদায় করা যায় না বা কোনো উন্নয়নও সম্ভব হয় না। সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে এবং সেই নেতৃত্বের ছায়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী সমন্বিত প্রচেষ্টায় তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। এসব কাজে অনেক ক্ষেত্রে এনজিওরা সফল হলেও অনেক নারী তাদের পরিবারের বাধার কারণে এসব সাংগঠনিক কাজে যোগদান করতে পারে না। একটা সংগঠনকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে না পারলে তা গতিশীল হয় না এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এনজিওরা পুরোপুরি সফল হতে পারছে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এনজিওদের সাফল্য বিরাট। সরকারের সহায়ক শক্তি হিসাবে ছোট বড় বেশিরভাগ এনজিওই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়া ও কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতদ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে দেশে শত শত ঝরে ও কর্মজীবী শিশু এনজিও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছে। এছাড়া বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম নারীদের আগ্রহ ততটা জোরালো না হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা কার্যক্রম দায়সারা হয়ে যায়।

এনজিওরা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা বললেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতপক্ষে তা অর্জন করা দুরূহ। নারী তার পছন্দের ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেবে এটা এখনও এদেশে সম্ভব হয়নি। যদিও এনজিওরা তাদের নারী উপকারভোগীদের এসব বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা তেমন কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি।

এনজিওরা দরিদ্র নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। যদিও এনজিওদের স্বাস্থ্য কার্যক্রম না থাকলে দরিদ্র মানুষের কাছে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাত না তথাপিও বলতে হয় খুব কম সংখ্যক এনজিওই বড় আকারে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। বেশিরভাগই শিশু ওজন, গর্ভবতী ওজন, টিকা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উঠোনে বৈঠক ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছে। এছাড়া কিছু কিছু এনজিও ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখলেও তার সংখ্যা কম। আর ধাত্রীরা সময় মত সেবা প্রদান করে না, ফলে মাতৃ মৃত্যু যতটা কমা প্রয়োজন ছিল ততটা কমছে না। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রমের জন্য উঠোন বৈঠক বা অন্যান্য কাজ করলেও দেখা যায় উপকারভোগী নারীরা সময় মত আসে

না বা অংশগ্রহণ করে না। আবার নারীরা এসব বিষয় বুঝলেও বাস্তবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান ততটা প্রয়োগ করতে পারে না। এক্ষেত্রে এনজিও কর্মীদের তেমন কিছু করার থাকে না। অনেক এনজিও আর্সেনিক নিরোধের জন্য কাজ করে, বিশুদ্ধ পানির জন্য ফিল্টার প্রদান করে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সারা দেশে আর্সেনিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় এনজিওদের পক্ষে সব খানে এ ধরনের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে আর্সেনিকের হাত থেকে জনগণকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না। কিশোর-কিশোরীদের জন্য কোনো কোনো এনজিও স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য শিক্ষা চালু করেছে যা খুবই প্রয়োজনীয়। উন্নত দেশে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এদেশে দু' একটা এনজিও এসব কাজ করে, তাও আবার রাজধানী ভিত্তিক। তাই সারাদেশে কিশোর-কিশোরীরা এর কোন সুফল ভোগ করতে পারছে না।

শহর ভিত্তিক কিছু এনজিও গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়, তাদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ছাড়া আর কোন বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। কারণ অধিকাংশ গার্মেন্টসে নারী কর্মীদের সময় মত বেতন দেয়া হয় না, তাদের সাথে পুরুষ সহকর্মী ও সুপারভাইজাররা খারাপ ব্যবহার করে। আবার অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে নারী শ্রমিকরা ভাল মজুরি পায় না। কিন্তু এনজিওদের নারী শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলা জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম নেই।

এনজিওরা নারীদেরকে সামাজিক বনায়ন, নার্সারি কার্যক্রম ইত্যাদির সাথে জড়িত করেছে। এতে অনেক ফার্ম বা নার্সারি গড়ে উঠলেও এসব নার্সারি থেকে উৎপাদিত চারা বিপণন তাদের জন্য একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনজিওরা উন্নতমানের বীজ প্রদান করে, নার্সারি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে কিন্তু বিপণনের জন্য পরামর্শ ব্যতীত তেমন কোন সহযোগিতা করে না। এমতাবস্থায় এসব গ্রামীণ নারী উপকারভোগীদের পক্ষে এসব চারা বিপণন করে লাভবান হওয়া খুবই দুরূহ হয়ে পড়ছে। ফলে তারা এ ধরনের নার্সারি তৈরিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

দরিদ্রদের মধ্যে এনজিও কার্যক্রমের শুরুতে সমাজ থেকে বিশেষ করে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনেক বাধাবিপত্তি এসেছে। সময়ের পরিক্রমায় এসব বাধা অনেকটা কমে আসলেও পুরোপুরি দুর হয়নি। এখনও অনেক স্থানে এনজিও কার্যক্রমের সাথে জড়িত হওয়ার অভিযোগে গ্রামীণ নারীরা বিভিন্ন

ফতোয়ার শিকার হচ্ছে। এছাড়া নারীদের এসব এনজিও কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার কারণে তাদের উপর কাজের চাপ বেড়ে যায়। নারীদেরকে ঘরের কাজ কর্ম করতে হয়, সন্তানাদি লালন-পালন করতে হয়, তারপর সময় বের করে এনজিও কার্যক্রমে অংশ নিতে হয়। অধিকাংশ পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা নারীকে কোন সাহায্য না করায় নারীরা বাইরের কাজে সময় দিতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হওয়ায় নারীরা ঠিক মত উন্নয়ন কার্যক্রমে শামিল হতে পারছে না।

এনজিওরা উপকারভোগীদেরকে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করে তোলে, যাতে স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেবা আদায় করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এসব দরিদ্র শ্রেণি এনজিওদের কাছ থেকে সেবা পেলেও সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা আদায়ে ততটা সক্ষম হয় না। ফলে কার্যত সরকারি সেবা প্রাপ্তি দরিদ্রদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, এনজিওরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তাদের মহৎ প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়। আর এইসব সীমাবদ্ধতাকে সাথী করেই এনজিওরা কাজ করছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য।

উপসংহার

এনজিওরা কল্যাণের ব্রত নিয়ে এদেশের মাটিতে কাজ শুরু করেছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারি সেবার অপ্রতুলতা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা এই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে অক্ষম। এ অবস্থায় কার্যক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থকা সত্ত্বেও বলা যায় এনজিওরা দরিদ্রদের জন্য আশার আলো বয়ে এনেছে।

বাংলাদেশের মত দুর্যোগপীড়িত দেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় যেখানে সরকারকে ব্যস্ত থাকতে হয় সেখানে দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান করার কথা চিন্তার বাইরে। এক্ষেত্রে এনজিওদের এই সব যুগান্তকারী পদক্ষেপ দেশকে অনেকখানি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে।

এনজিওদের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা দুই দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, ঋণদান কর্মসূচির ক্ষেত্রে কোন কোন উপকারভোগী ঋণের সঠিক প্রয়োগ করলেও বেশিরভাগ ঋণ গ্রহীতা ঋণের সঠিক

বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় এবং অনেক দরিদ্র পরিবারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

আবার সচেতনতা কার্যক্রম শত ভাগ সফল না হলেও দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে নারীরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছে এবং এই সচেতনতার ফরে দরিদ্র পরিবারে অসুখ-বিসুখের হার কমে এসেছে। শিশু মৃত্যু হার কমেছে। নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওরা যথাসাধ্য কাজ করছে। এনজিওদের আগে এদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের কথা কেউ বলেনি বা চিন্তা করেনি। ক্ষমতায়ন যতটুকুই হচ্ছে বা ক্ষমতায়নের চর্চায় এনজিওরাই অগ্র পথিক হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিওর কার্যক্রমের শুরুতে এনজিওর সাথে কাজ করার অপরাধে বহু নারী ও তাদের পরিবার ফতোয়ার শিকার হয়েছে। কিন্তু এনজিওরা এসব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে নারীদের সাথে কাজ করেছে, তাদের পরিবারকে স্বচ্ছলতার দিকে নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি এসব ফতোয়া রোধে মোল্লা-মৌলবিদের সাথেও কাজ করেছে, যার ফলে এনজিওর সাথে কাজ করা নিয়ে ফতোয়া প্রদানের হার অনেক কমে গেছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সব ধরনের নিরক্ষর মানুষকে আওতাভুক্ত না করতে পারলেও সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের যে সফলতা এখন দেখা যাচ্ছে, তার একটা বড় অংশের কৃতিত্ব দেয়া যায় এনজিওদের। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানান অনিয়ম সত্ত্বেও এনজিওদের অবদানের ফলেই অনেক জেলা আজ নিরক্ষরমুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে দরিদ্ররা এনজিওদের দেয়া সুবিধাটাই ভোগ করে থাকে। সরকারি সেবা বা পয়সা দিয়ে কেনা সেবা কোনটাই তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাই এনজিওরা যতটুকু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তা সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে না পারলেও দরিদ্র মানুষের জন্য তা অনেকখানি স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রায় ঘরে ঘরে চলে। আর দরিদ্র পরিবারে এ নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছে। যৌতুকের দাবি, যখন তখন তালাক, স্বামীর বহুবিবাহ ইত্যাদি কারণে নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়। এসব প্রতিরোধে সরকারি আইন থাকলেও তা দরিদ্ররা পয়সার অভাবে কোন কাজে লাগাতে পারে না। তাই এনজিওরা এসব নারীদের জন্য আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে এবং আইনি জ্ঞান প্রদান করে। সুতরাং বলা যায় এই ক্ষেত্রে এনজিওরা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ের ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

গবেষণার একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে গবেষণা নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ, তা বিশ্লেষণ এবং ফলাফল উপস্থাপন। বর্তমান গবেষণায় যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা আবশ্যক। এ তথ্য সমূহ ব্র্যাকের কার্যক্রম এলাকা গাজীপুর সদর উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতা হিসেবে ব্র্যাকের ১০০ উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসনের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫.১ উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

উপকারভোগীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য, সমিতির সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতায়ন, পরিবার-পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তন হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫.১.১ উপকারভোগীদের জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য

এ অংশে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের বয়স, পরিবারের ধরন, শিক্ষা, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, কৃষি জমি, গৃহাঙ্গন ইত্যাদি বিশ্লেষণ কর হয়েছে।

সারণি ৫.১ উপকারভোগীর বয়স		
বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১৫-২৫	২৩	২৩
২৬-৩৫	৪৯	৪৯
৩৬-৪৫	২১	২১
৪৬- উপরে	৭	৭
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১

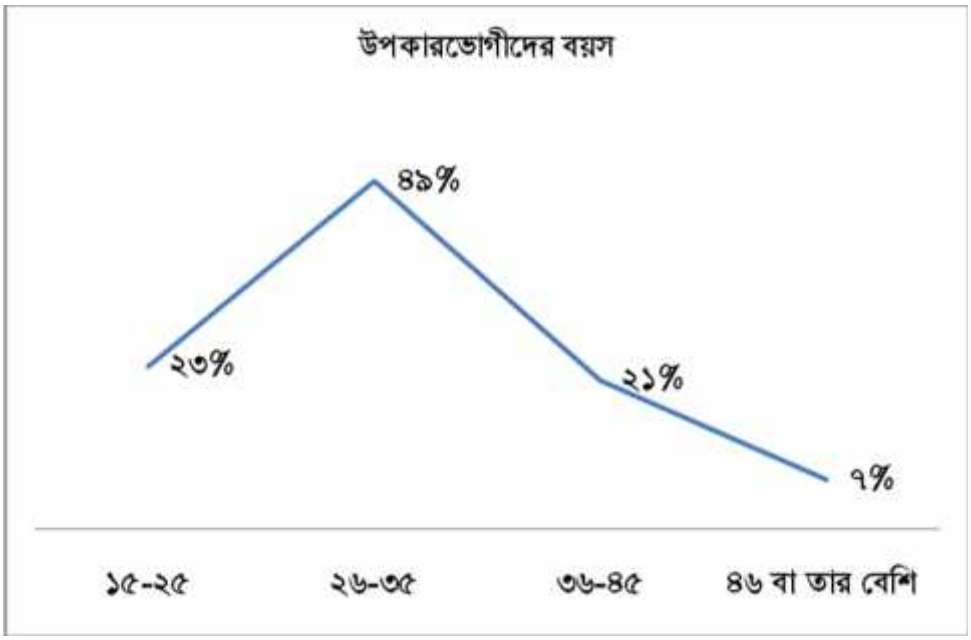

এনজিওর সাথে জড়িত উপকারভোগীদের বয়স সম্পর্কিত তথ্য সারণি ৫.১ এ দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য ৪৯ শতাংশ সদস্যের বয়স ২৬ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ১৫ থেকে ২৫ বছরের বয়সের সদস্য। সর্বনিম্ন সংখ্যক সদস্য অর্থাৎ ৭ শতাংশ সদস্যের বয়স ৪৬ থেকে উপরের দিকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্র্যাকের সুবিধাভোগী নারীদের মধ্যে সব বয়সের নারীই রয়েছে। তবে অধিকাংশ সদস্যই মধ্য বয়সের। অর্থাৎ কর্মক্ষম নারীদের হার বেশি।

সারণি ৫.২ উপকারভোগীদের পরিবারের ধরন		
পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
একক পরিবার	৬৩	৬৩
যৌথ পরিবার	৩৭	৩৭
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২

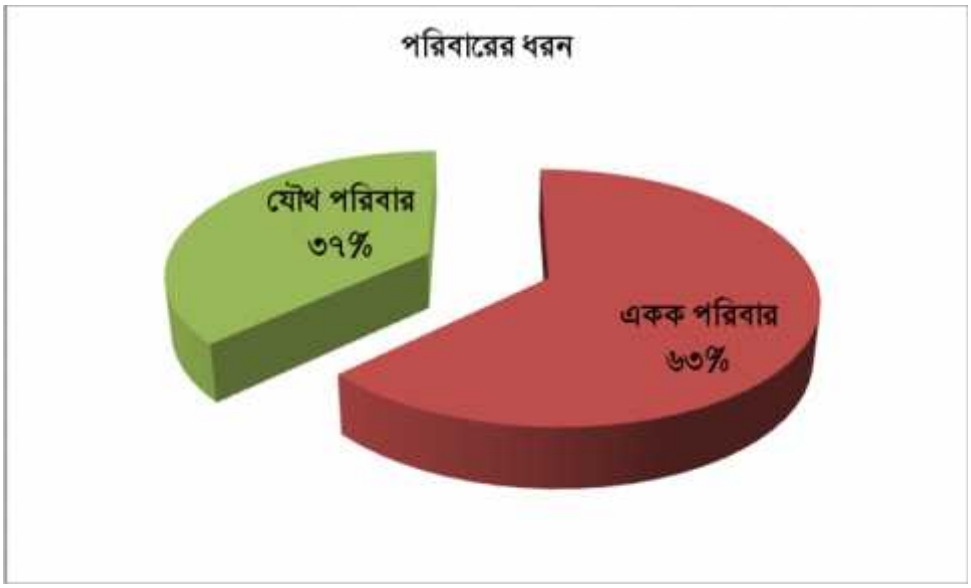

দেখা যাচ্ছে, উত্তরদাতা সদস্যদের মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ সদস্যই একক পরিবারে বসবাস করে। যৌথ পরিবারে বাস করে ৩৭ শতাংশ। গবেষণাধীন এলাকা গাজীপুর সদর উপজেলা হওয়ায় এখানে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া বর্তমানে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জীবিকার তাগিদে এখন মানুষ সনাতন যৌথ পরিবার প্রথা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সারণি ৫.৩ উপকারভোগীদের শিক্ষাস্তর

শিক্ষাস্তর	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	১২	১২
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত	২৮	২৮
ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি	৩৯	৩৯
এস এস সি	১৫	১৫
এইচ এস সি	৬	৬
স্নাতক	০	০
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৩

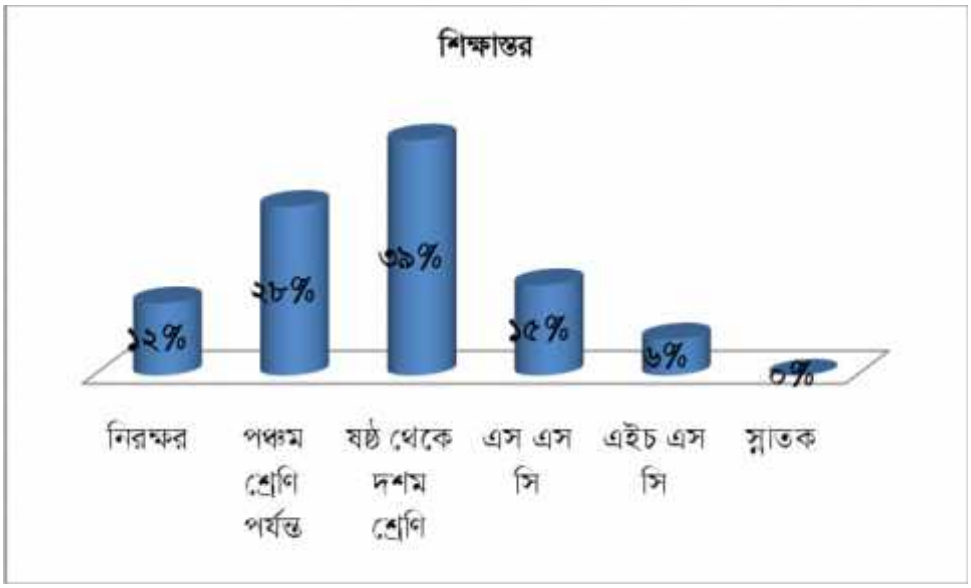

উপকারভোগীদের শিক্ষাস্তর সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের ১২ শতাংশ সদস্য নিরক্ষর। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে ২৮ শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক ৩৯ শতাংশ। এস এস সি ১৫ শতাংশ এবং এইচ এস সি ৬ শতাংশ। তবে স্নাতক বা ডিগ্রি পর্যায়ের কোন সদস্য পরিলক্ষিত হয়নি। সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে নিরক্ষর ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪০ শতাংশ সদস্য শিক্ষার দিক থেকে একেবারেই কম মাত্রার। তাছাড়া ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে যারা রয়েছে তারাও শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুবিধাভোগী নারীদের তিন ভাগের দু'ভাগেরও বেশি সদস্য নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত এবং এ শ্রেণির নারীদের মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা একটু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সারণি ৫.৪ উপকারভোগীদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অবিবাহিত	০	০
বিবাহিত	৮৩	৮৩
বিধবা	১০	১০
তালাক প্রাপ্তা	৩	৩
স্বামী পরিত্যক্তা	৪	৪

মোট	১০০	১০০

উপকারভোগীদের মধ্যে অবিবাহিত সদস্য একজনও নেই। তবে বিবাহিত অর্থাৎ স্বামী আছে এ ধরনের সদস্য ৮৩ শতাংশ। বিধবা সদস্য ১০ শতাংশ। তালাক প্রাপ্তা ৩ শতাংশ এবং স্বামী পরিত্যক্তা ৪ শতাংশ। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় জানা যায়, এনজিওরা প্রাপ্তবয়স্কদের ঋণ দিয়ে থাকে। সাথে সাথে এটাও দেখা যায় বিবাহিত নারীদেরকেই ঋণ দেয়া হয় অর্থাৎ যাদের স্বামী বা সন্তান বা অন্য কোন পুরুষ সদস্য রয়েছে তাদেরকে ঋণ দেয়া হয়। কেননা ঋণের নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে জড়িত। এ কারণেই ১৫ থেকে ১৮ বছরের কিছু সদস্যও রয়েছে যাদের বিবাহ হয়ে গেছে।

সারণি ৫.৫ উপকারভোগীদের পেশা		
পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষি কাজ	১	১
দিন মজুর	৫	৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১০	১০
গৃহিণী	৫৮	৫৮
শিল্প শ্রমিক	১৯	১৯
অন্যান্য	৭	৭
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৪

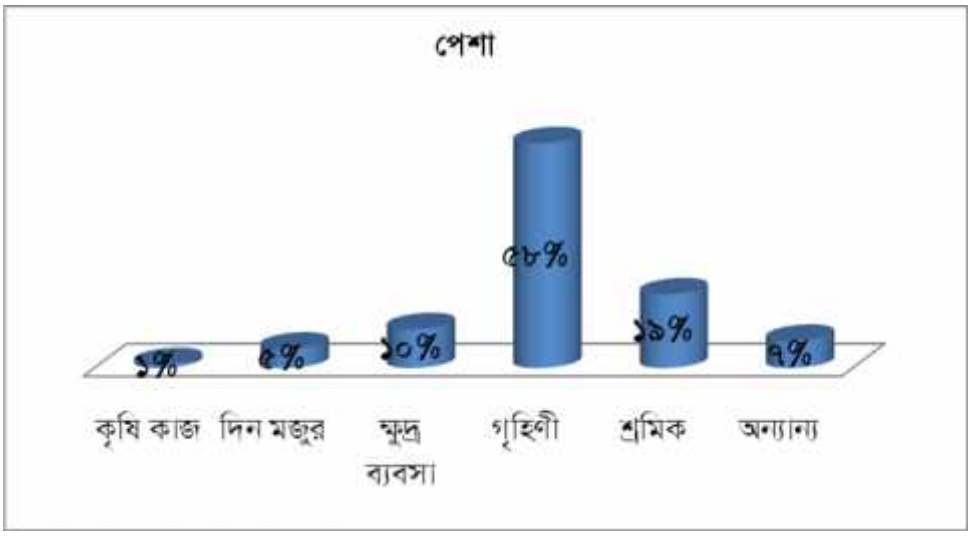

পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাসে দেখা যায়, উপকারভোগীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ সদস্য গৃহিণী। তবে বিভিন্ন শ্রমের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ১৯ শতাংশ সদস্য। যারা বিভিন্ন শিল্পকারখানা, গার্মেন্টসে কাজ করে। এছাড়া ছোট খাট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ১০ শতাংশ। বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় দেখা যায় গৃহিণীদের অনেকেই তাদের স্বামী বা সন্তানের জন্য ঋণের টাকা উত্তোলন করেন বা সংসারের প্রয়োজনে ঋণ উত্তোলন করেন। তবে অনেকে নিজের প্রয়োজনেও এনজিওদের সাথে জড়িত। তবে গৃহিণী ছাড়া বাকি ৪২ শতাংশ সদস্য বিভিন্ন পেশায় জড়িত যারা সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে ইচ্ছুক।

সারণি ৫.৬ উপকারভোগীদের কৃষি জমির পরিমাণ

কৃষি জমি শতকে	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০	৫৪	৫৪
১-৫	২৯	২৯
৬-১০	৯	৯
১১-২০	৬	৬
২১ থেকে উপরে	২	২
মোট	১০০	১০০

এনজিওরা সাধারণত দরিদ্র নারীদের নিয়ে কাজ করে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করে। উপকারভোগীদের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় ব্র্যাকের শতকতা ৫৪ শতাংশ সদস্যের কোন কৃষি জমি নেই। ২ থেকে ৫ শতক জমি রয়েছে ২৯ শতাংশ সদস্যের। অর্থাৎ সদস্যদের তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি সদস্যের কৃষি জমি নেই বা খুব কম জমি রয়েছে। এবং তারা ভাগ্যোন্নোয়নে এনজিওর সাথে তারা জড়িত।

সারণি ৫.৭ উপকারভোগীদের গৃহাঙ্গনের জমি		
গৃহাঙ্গনের জমি শতাংশে	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০	১২	১২
১-৫	৫২	৫২
৬-১০	১৭	১৭
১১-২০	১২	১২
২১ থেকে উপরে	৭	৭
মোট	১০০	১০০

দেখা যাচ্ছে ব্র্যাকের সুবিধাভোগী সদস্যদের শতকরা ১২ জনের কোন কোন জমিই নেই। পরের জায়গায় তারা থাকে। এছাড়া অর্ধেকেরও বেশি তথা ৫২ শতাংশ সদস্যের গৃহাঙ্গনের জমি রয়েছে ১ থেকে ৫ শতাংশ। ৬ থেকে ১০ শতাংশ জমি রয়েছে ১৭ ভাগের। এছাড়া ১২ শতাংশের ১১ থেকে ২০ শতাংশ এবং ৭ ভাগের ২১ শতাংশের উপর জমি বাড়ির জমি রয়েছে। দেখা যাচ্ছে সংস্থার সুবিধাভোগীদের কেউ কেউ পরের জমিতে থাকে। তাছাড়া অনেকেরই বাড়ির জমির পরিমাণ একেবারেই কম।

৫.১.২ উপকারভোগীদের ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

এই অংশে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের ঋণ গ্রহণ, আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৫.৮ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ			
ঋণের পরিমাণ হাজার	প্রথমবার	দ্বিতীয়বার	তৃতীয়বার
২-৫	৫৯	২৬	১৫
৬-১০	৪১	৪৯	২৪
১০-উপরে	০	১৫	১৫
নেয়নি	০	১০	৪৬

মোট	১০০	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৫

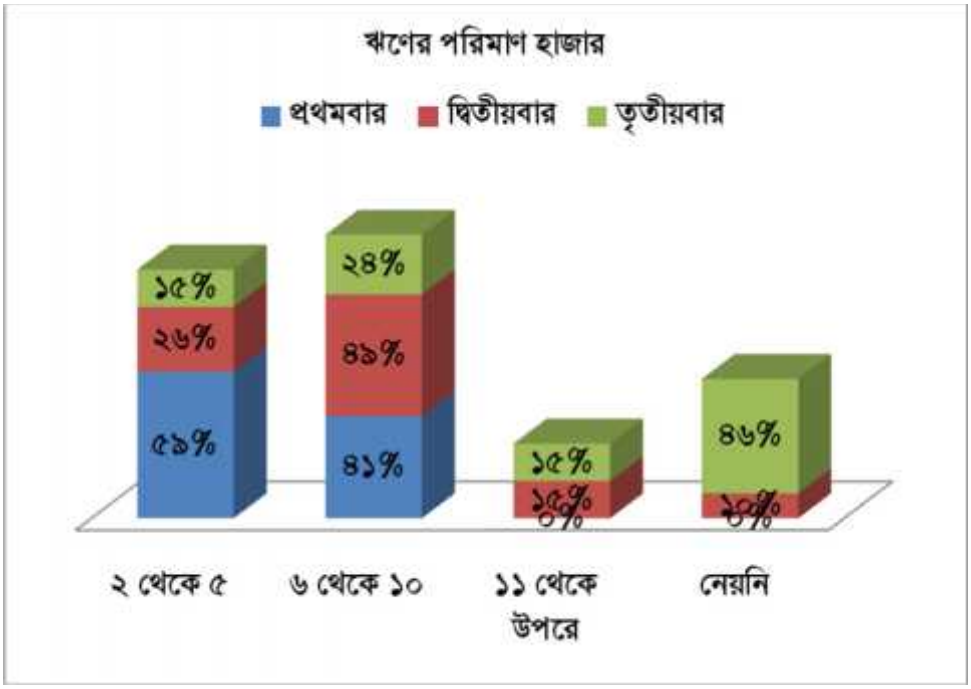

চিত্রে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতা সুবিধাভোগীদের শত ভাগই প্রথমবার ঋণ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ২ হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে ৫৯ শতাংশ। ৪১ শতাংশ ৬ হাজার থেকে ১০ হাজারের মধ্যে ঋণ নিয়েছে। প্রথমবারে ১১ হাজার বা তারও বেশি ঋণ নেয়নি কোন সুবিধাভোগী।

দ্বিতীয়বার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে চিত্রে দেখা যাচ্ছে, সুবিধাভোগীদের ২৬ শতাংশ ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে দ্বিতীয়বার। তবে ৪৯ শতাংশ সদস্য দ্বিতীয়বারে ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার ঋণ নিয়েছেন। এছাড়া ১৫ শতাংশ সুবিধাভোগী দ্বিতীয়বারে ১১ হাজার বা তার বেশি ঋণ নিয়েছে। অন্যদিকে ১০ শতাংশ সুবিধাভোগী দ্বিতীয়বারে ঋণ গ্রহণ করেননি। প্রথম ও দ্বিতীয়বারে তুলনায় দেখা যাচ্ছে প্রথম বার ৪১ শতাংশ ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার ঋণ নিলেও দ্বিতীয় বারে এক্ষেত্রে ঋণ নিয়েছে ৪৯ শতাংশ সদস্য। অর্থাৎ দ্বিতীয়বারে ৬ থেকে ১০ হাজার ঋণ নেয়া সদস্যদের অনেকেই প্রথমবার ঋণ নিয়ে ভালো করেছেন। তাছাড়া আরও কিছু অর্থাৎ ১৫ শতাংশ সুবিধাভোগী দ্বিতীয়বারে ১১ হাজার বা তার উপরে ঋণ নিয়েছেন যা ঋণ গ্রহীতার উন্নতি নির্দেশ করে। কেননা প্রথমবারের কোন সদস্যই এ পরিমাণ ঋণ নেয়নি। তবে দ্বিতীয়বারে ১০ শতাংশ সদস্য ঋণ গ্রহণ করেননি।

তৃতীয়বার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৫ শতাংশ সদস্য ২ থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ তুলেছেন। ২৪ শতাংশ সদস্য ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১৫ শতাংশ সদস্য নিয়েছেন ১১ হাজার টাকার উপরে। তবে এখানে ৪৬ শাতাংশ সদস্য ঋণ নেননি। দেখা যাচ্ছে প্রায় অর্ধেক সদস্য তৃতীয়বারে ঋণ নেননি। এক্ষেত্রে কারণ আলোচনায় দেখা যায় অনেকে সংস্থার সদস্য হয়েছেন বেশি দিন হয়নি। আবার কেউ কেউ পারিবারিকভাবে ঋণ নিয়ে ভালো করতে পারেননি বিধায় তৃতীয়বার ঋণ নেননি। আবার আর্থিকভাবে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থা হওয়ার কারণেও কেউ কেউ তৃতীয়বার ঋণ নেননি। তবে তৃতীয়বারে এমন অনেকে ঋণ নিয়েছেন যারা প্রথম ও দ্বিতীয়বারে ঋণ নিয়ে ভালো করতে পেরেছেন।

সারণি ৫.৯ উপকারভোগীদের আয়ের পরিবর্তন

আয়ের পরিবর্তন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৭২	৭২
কমেছে	৬	৬
একই রকম আছে	২২	২২
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৬

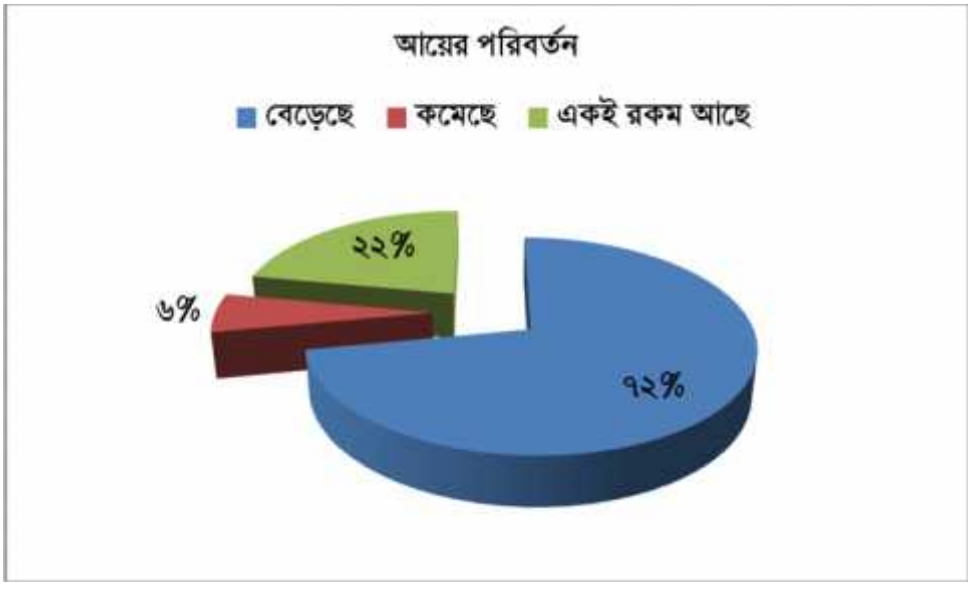

আয়ের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সংস্থার সদস্য ৭২ শতাংশের আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কমেছে ৬ শতাংশের এবং একই রকম আছে ২২ শতাংশের। উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনায় দেখা যায়, যাদের আয় বেড়েছে তারা সংস্থা থেকে টাকা তুলে উৎপাদনমূখী কোন কাজে বিনিয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু অনেকেই পরিবারের ঘাটতি মেটাতে, সন্তানের চাহিদা মেটাতে, স্বামীর প্রয়োজনে টাকা তুলেছেন এবং ব্যয় করেছেন। ফলে কয়েক জনের ঘাটতি বেড়েছে আবার অনেকের ঘাটতি না হলেও কোন উন্নতি হয়নি ২২ শতাংশের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আয় বর্ধক কাজে ঋণের টাকা বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৫.১০ উপকারভোগীদের আয় বাড়ার কারণ সমূহ (একাধিক উত্তর)		
আয় বৃদ্ধির কারণ সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ব্যবসা করতে পারছে	১০	১০
আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশল শিখতে পারছে	৩৫	৩৫
মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে	৩০	৩০
ঋণ শোধ করে আবার ঋণ এনেছে	৩৪	৩৪

লেখচিত্র- নং: ৭

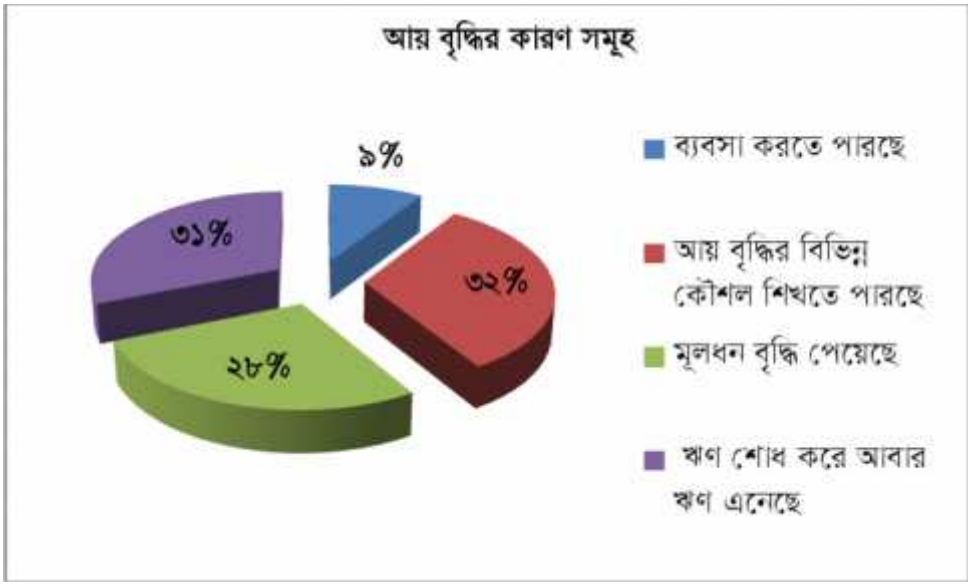

আয় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরে দেখা যায়, যাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তারা আয় বর্ধক কাজ যেমন, ব্যবসা করা, অন্যান্য কাজের প্রশিক্ষণ পেয়ে ভালোভাবে কাজ করা, প্রচেষ্টার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং ঋণ পরিশোধ করে আবার ঋণ এনে নতুন ভাবে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। অর্থাৎ ঋণ এনে যথাযথভাবে উৎপাদনমূখী খাতে তারা কাজে লাগিয়েছে এবং নিজেদের পূর্বের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

এনজিও কার্যক্রমের মূল উপাদান ঋণ প্রদান। প্রতিটি উপকারভোগী এই ঋণ গ্রহণের মাধ্যমেই মূলত নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অন্যান্য সুবিধা বা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মূলধন না হলে দরিদ্র নারীদের কোন উপকার হয় না। ফলে ঋণ গ্রহণ এবং তা উৎপাদনমূখী কাজে বিনিয়োগ করতে পারার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

৫.১.৩ উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য

এ অংশে উপকারভোগীদের সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা, কর্মসংস্থান, খাদ্য গ্রহণ, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৫.১১ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততার সময়কাল

সম্পৃক্ততার সময়কাল	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-২ বছর	১৫	১৫
২ বছর ১ মাস-৪ বছর	২৬	২৬
৪ বছর ১ মাস-৬ বছর	৩৫	৩৫
৬ বছর ১ মাস-৮ বছর	১৫	১৫
৮ বছর ১ মাস- উপরে	৯	৯
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৮

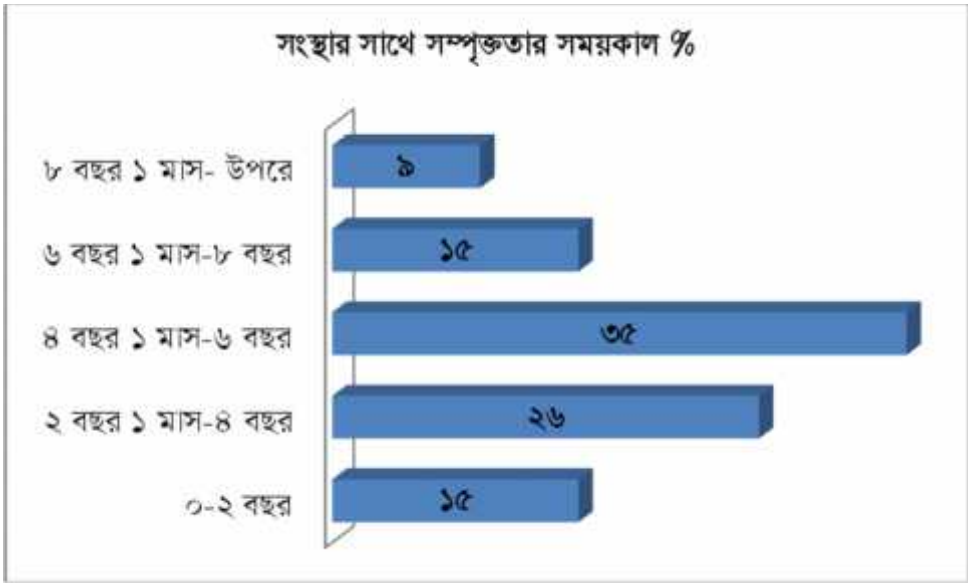

তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ৪ বছর থেকে ৬ বছর সংস্থার সাথে জড়িত সদস্যের সংখ্যা সর্বাধিক ৩৫ শতাংশ। এছাড়া ২ থেকে ৪ বছরের সদস্য ২৬ শতাংশ, ৬ থেকে ৮ বছরের সদস্য ১৫ শতাংশ, ৮ বছর বা তার উপরের সদস্য ৯ শতাংশ। তাছাড়া দুই বছর বা তার কম সময়ের সদস্য হওয়া সদস্য ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৪ বছর থেকে তার উপরের সদস্য সংখ্যা ৫৯ শতাংশ।

সারণি ৫.১২ সদস্য হওয়ার পর কর্মসংস্থানে পরিবর্তন		
কর্মসংস্থানে পরিবর্তন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজের কর্মসংস্থান হয়েছে	২০	২০
পরিবারের অন্য কারো কর্মসংস্থান	৩৬	৩৬
নিজ ও অন্যান্যদের কর্মসংস্থান	১৬	১৬
কর্মসংস্থান হয়নি	২৮	২৮
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৯

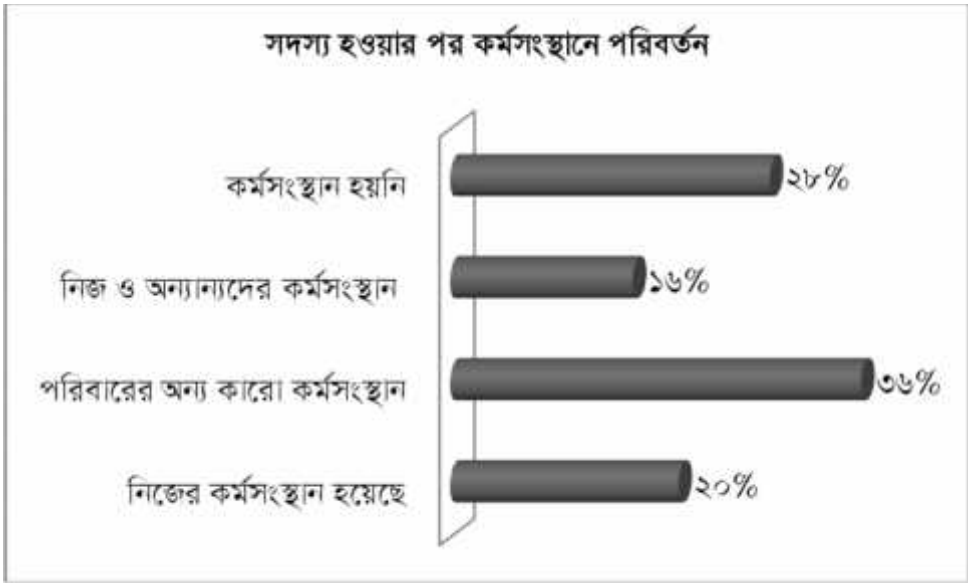

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সংস্থার সদস্য হওয়ার পর সদস্যদের কর্মসংস্থান হয়েছে ২০ শতাংশের। তাছাড়া পরিবারের অন্যান্যদের কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৬ শতাংশের এবং সদস্য ও তার পরিবারের কর্মসংস্থান হয়েছে এমন সংখ্যা ১৬ শতাংশ। এবং কোন কর্মসংস্থান হয়নি এমন সংখ্যা ২৮ শতাংশ। সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে বাড়িতে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করা। যেমন, হাস-মুরগি পালন, সেলাই মেশিন, মেস পরিচালনা, পরিবারের পুরুষ সদস্যের জন্য রিকশা বা ভ্যান ক্রয়, মুদি দোকান, কাঁচামালের ব্যবসা ইত্যাদি কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে।

সারণি ৫.১৩ পরিবারের গড় মাসিক আয়		
মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-৩০০০	১৬	১৬
৩১০০-৫০০০	২৬	২৬
৫১০০-৭০০০	২৪	২৪
৮১০০-১০০০০	১৪	১৪
১০১০০-১২০০০	১১	১১
১২১০০- উপরে	৯	৯

মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১০

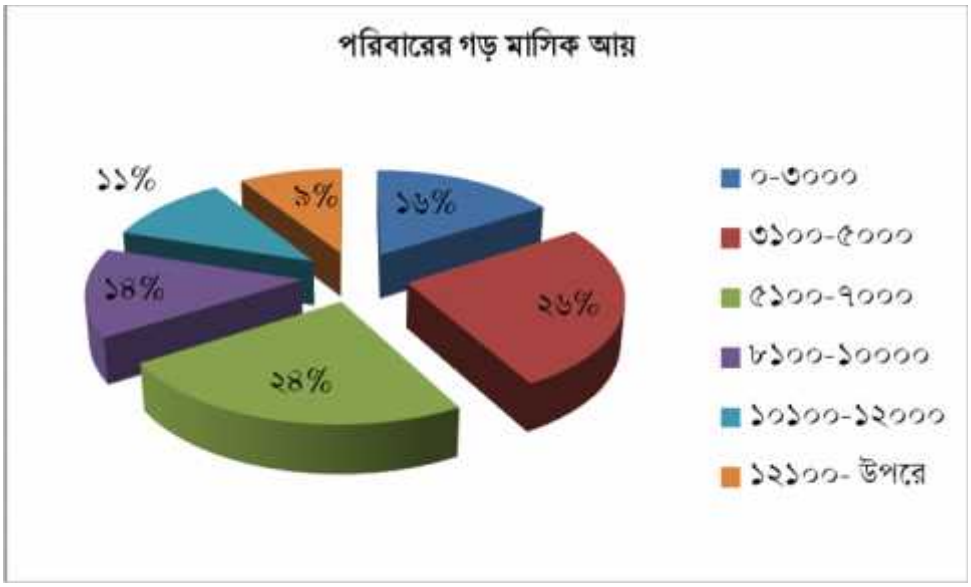

উপকারভোগী পরিবারের গড় মাসিক আয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতার পরিবারের গড় মাসিক আয় ৩ হাজার থেকে ৫ হাজারের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ৫ হাজার থেকে ৭ হাজারের মধ্যে ২৪ শতাংশ সদস্য। তবে ৩ হাজারের মধ্যে আয় করে এমন সদস্যও রয়েছে ১৬ শতাংশ। এছাড়া ৮ থেকে ১০ হাজার আয় করে এমন পরিবার ১৪ শতাংশ, ১০ থেকে ১২ হাজার আয় করে এমন পরিবার ১১ শতাংশ এবং ১২ হাজার টাকার উপরে আয় করে এমন সদস্য ৯ শতাংশ। তবে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে ১ থেকে ৭ হাজার টাকা উপার্জনকারী পরিবারগুলো খুব দরিদ্র।

সারণি ৫.১৪ পরিবারের গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি

মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-৫০০	২৪	২৪
৬০০-১০০০	২০	২০
১১০০-১৫০০	২৩	২৩
১৬০০-২০০০	১৩	১৩
২১০০-৩০০০	৯	৯
৩১০০-৪০০০	৭	৭

৪০০০ এর উপরে	৪	৪
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১১

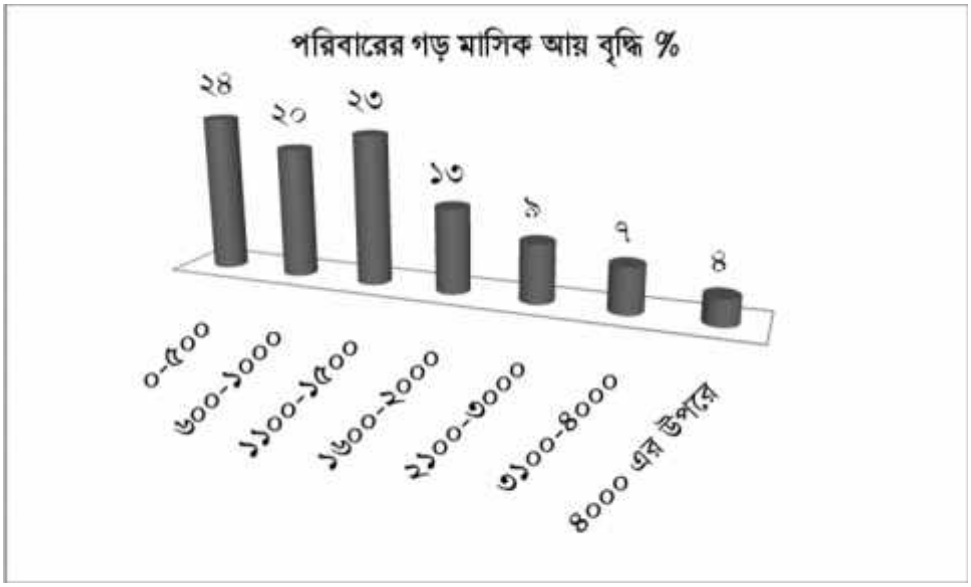

উপকারভোগীদের মধ্যে মাসিক আয় বৃদ্ধির চিত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক সদস্যেরই আয় কম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে ২৪ শতাংশ সদস্যের মাসিক আয় পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০ শতাংশ সদস্যের পরিবারে মাসিক আয় এক হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৩ শতাংশের পরিবারের দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ১৩ শতাংশ সদস্যের পরিবার তাদের আয় দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ৯ শতাংশ সদস্যের পরিবারে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ শতাংশ সদস্যের পরিবারে চার হাজার টাকা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪ শতাংশ সদস্যের পরিবারে চার হাজার টাকার উপরে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৫.১৫ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধা (একাধিক উত্তর)		
সুবিধা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
চিকিৎসা সেবা	৫২	৫২
পরিবার-পরিকল্পনা সেবা	৪১	৪১
মাতৃকল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা	৫	৫

বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	৪১	৪১
শিশু শিক্ষার সুযোগ	৪৯	৪৯
অন্যান্য	১৬	১৬

লেখচিত্র- নং: ১২

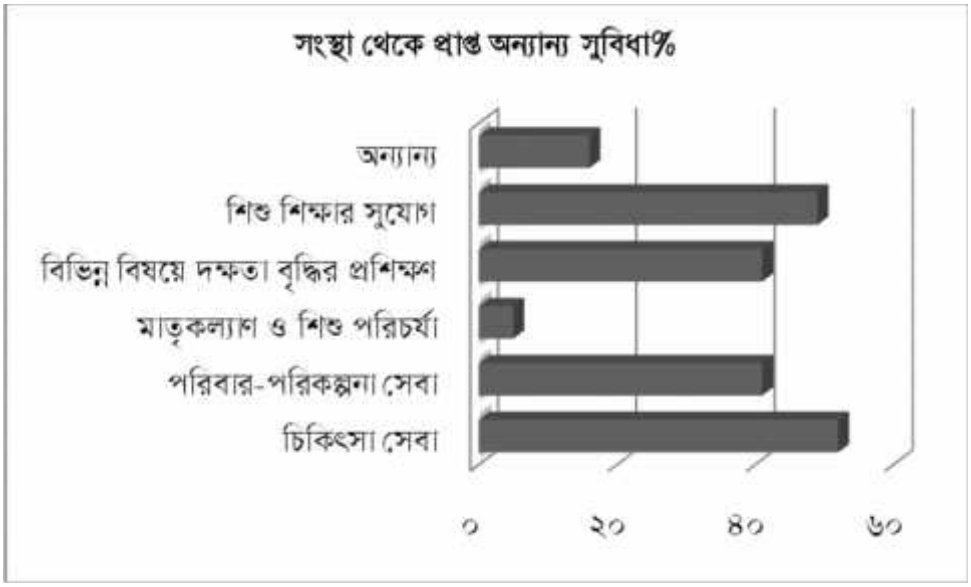

এনজিও থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংস্থাগুলো চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা, মাতৃকল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা, দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি সুবিধা সমূহ দিয়ে থাকে। সংস্থাগুলো সদস্যদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ দানের পাশাপাশি এ সেবাগুলো দিয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে ব্র্যাকের সদস্য ৫২ শতাংশই চিকিৎসা সেবা পায় সংস্থা থেকে। পরিবার পরিকল্পনা সেবা পেয়ে থাকে ৪১ শতাংশ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ৪১ শতাংশ, শিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে ৪৯ শতাংশ পরিবার। এনজিও প্রদত্ত এসব সুযোগ সুবিধা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এনজিওগুলো নারীদেরকে পরিবারের উন্নয়ন সহযোগী, অর্থ উপার্জনকারী, সচেতন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের মূল ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তৈরি করেছে যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বড় ধরনের উদাহরণ।

সারণি ৫.১৬ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন		
আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)

হ্যাঁ	৬২	৬২
একই রকম আছে	৩৮	৩৮
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১৩

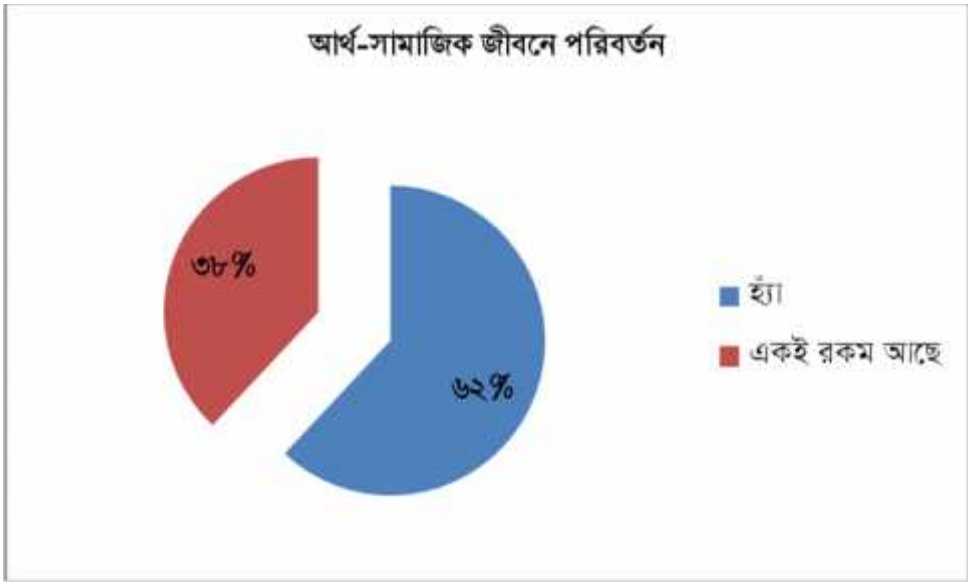

এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে নারীর আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ৬২ শতাংশ সদস্য বলেছেন তাদের পরিবর্তন এসেছে। তবে একই রকম আছে ৩৮ শতাংশ সদস্যের অবস্থান। সার্বিকভাবে ৬২ শতাংশ সদস্যের আর্থ-সামাজিক জীবনে উন্নয়ন এনজিওর ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্পষ্ট করে।

সারণি ৫.১৭ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের ধরন		
পরিবর্তনের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আয়ের কারণে গুরুত্ব বেড়েছে	৩৫	৩৫
ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারছে	২৩	২৩
পরিবারকে স্বাবলম্বী করছে	৩১	৩১
সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বৃদ্ধি	৪৫	৪৫

সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি	১৬	১৬

লেখচিত্র- নং: ১৪

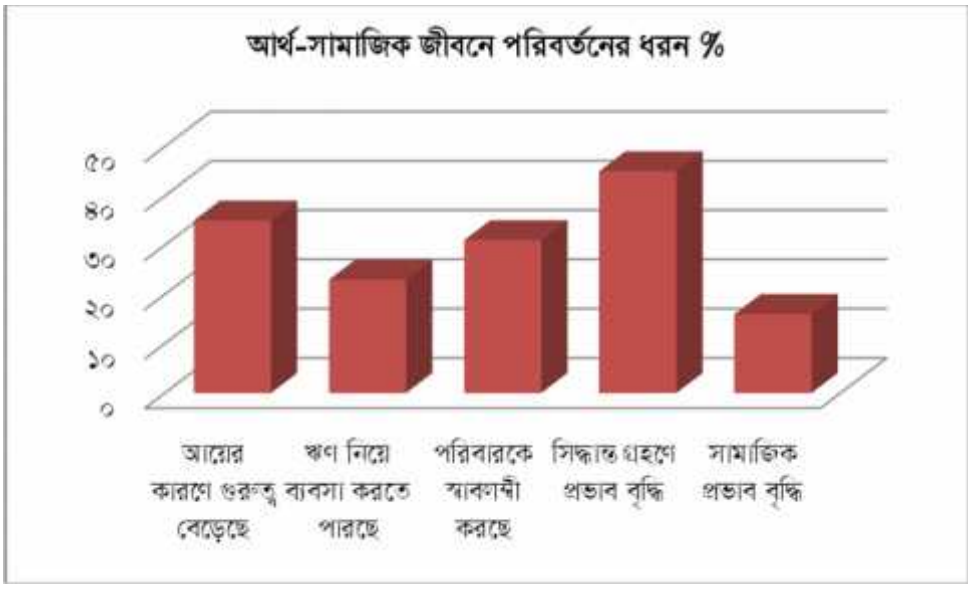

আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধরন সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, নারীরা এখন আয় করে, ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারছে, পরিবারকে স্বাবলম্বী করছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে, সামাজিকভাবে প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৩৫ শতাংশ সদস্য বলেছেন, আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের গুরুত্ব বেড়েছে। ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারার কারণে আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্ব বেড়েছে ২৩ শতাংশ সদস্যের। ৩১ শতাংশ সদস্য পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়েছেন বিধায় তাদের গুরুত্ব বেড়েছে। সিদ্ধান্তে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫ শতাংশ সদস্যের। তাছাড়া সামাজিকভাবে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ শতাংশ সদস্যের। সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে সংস্থার সদস্য হওয়ার পর নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করেছে।

৫.১.৪ উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

এ অংশে উপকারভোগীদের সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এনজিওরা তাদের সুবিধাভোগী নারীদেরকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যাতে তারা নিজেদের সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রশিক্ষণের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়- ব্যবসা পরিচালনা, দল ব্যবস্থাপনা, সেলাই, হস্তশিল্প, বিভিন্ন চাষাবাদ, পশু পালন, বনায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জেন্ডার সচেতনতা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সারণি ৫.১৮ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ (একাধিক উত্তর)

প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ব্যবসা পরিচালনা	৪০	৪০
সেলাই, হস্তশিল্প	৩৫	৩৫
গবাদি পশু পালন ও বনায়ন	৩২	৩২
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতনতা, মাতৃস্বাস্থ্য	৫৯	৫৯
নারী-পুরুষ সমতা	৬০	৬০
দল ব্যবস্থাপনা	২০	২০

লেখচিত্র- নং: ১৫

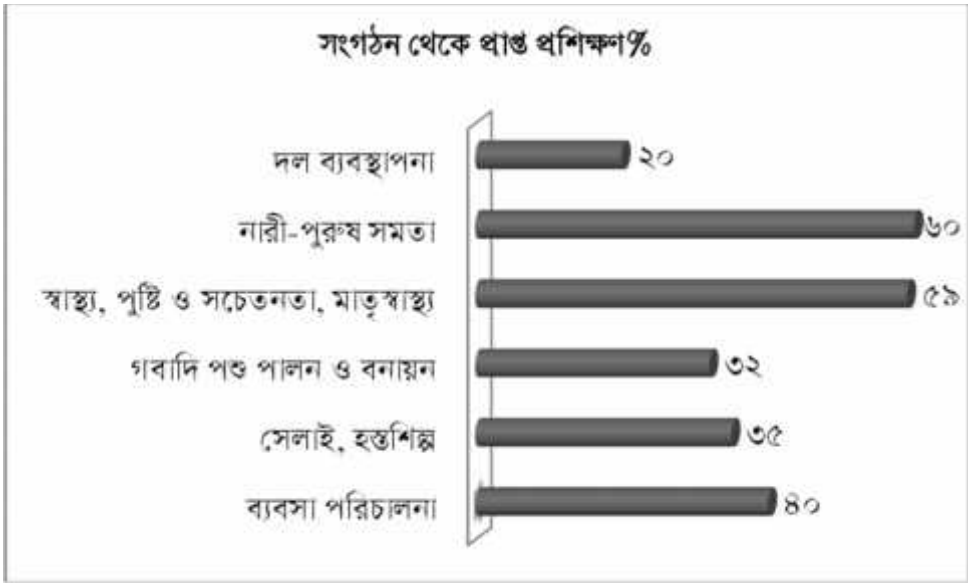

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনার উপর শতকরা ৪০ শতাংশ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ৩৫ শতাংশ, গবাদি পশু, মুরগি পালন বা বনায়ন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ৩২ শতাংশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতনতা ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ পায় ৫৯ শতাংশ সদস্য পেয়ে থাকে, নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৬০ শতাংশ এবং দল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২০ শতাংশ। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলো নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

সারণি ৫.১৯ প্রশিক্ষণের প্রভাব (একাধিক উত্তর)

প্রভাব	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারা	১৯	১৯
পরিবারে থেকেই আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করতে পারা	৪৬	৪৬
নিজের ভাল মন্দ বোঝা	৫২	৫২
নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	৪৩	৪৩
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতনতা, মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	৪৬	৪৬
নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	২৫	২৫
দল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি	১০	১০

প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেয়া যায়, প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগী নারীদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা নিজেরাই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছে, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারছে, সমাজে ও পরিবারে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, দক্ষতা অর্জন করার ফলে ঘরে বসেই অনেক কাজ করতে পারছে, স্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, দলীয় কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বুঝতে পারছে। ব্র্যাকের ১৯ শতাংশ সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়ে ব্যবসা করতে পারছে, ৫২ শতাংশ সদস্য নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারছে, ৪৩ শতাংশের পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘরে বসেই বিভিন্ন কাজ করে ৪৬ শতাংশ সদস্য তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারছে, ৪৬ শতাংশ সদস্য তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এছাড়া নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে ২৫ শতাংশ সদস্য, দল ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশ সদস্যের। ফলাফলগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়,

সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নারীদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তাছাড়া নারীদেরকে কর্মমুখী করতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

৫.১.৫ সংস্থার সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

এ অংশে সংস্থার সচেতনতামূলক কার্যক্রমে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ যেমন- নিরাপদ পানি পান, খাবার গ্রহণ প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৫.২০ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর উপকারভোগী ও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা

খাদ্য গ্রহণের অবস্থার পরিবর্তন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৭২	৭২
কমেছে	০	০
একই রকম আছে	২৮	২৮
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১৬

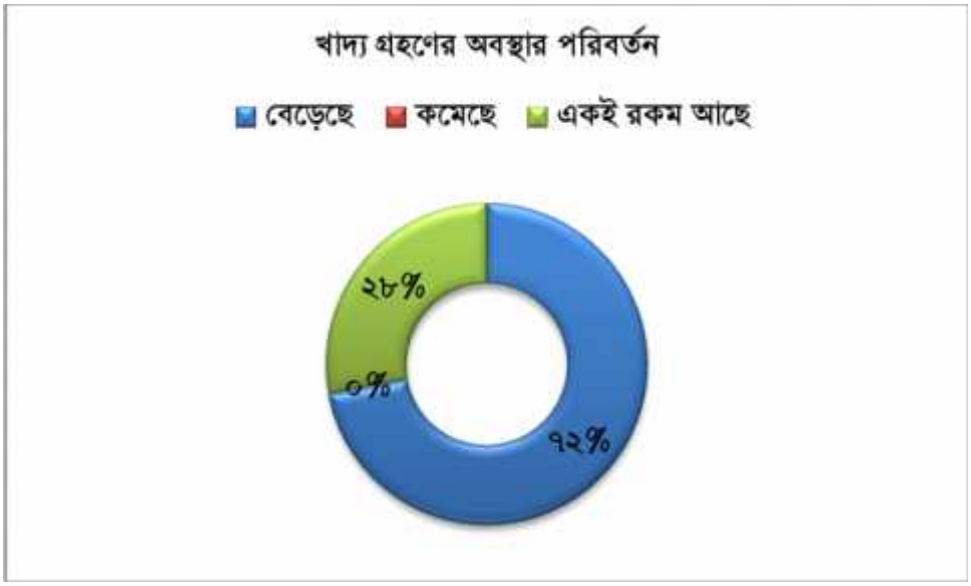

দেখা যাচ্ছে সংস্থার সদস্য হওয়ার পর উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের খাদ্যগ্রহণে পরিবর্তন এসেছে ৭২ শতাংশের। আর্থিক উন্নয়নের ফলে সদস্যদের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা

পরিবর্তন এসেছে। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সদস্যদের পরিবারে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক খাদ্য গ্রহণের মান পূর্বের তুলনায় পরিবর্তন হয়েছে।

সারণি ৫.২১ নিরাপদ খাবার পানি গ্রহণের অবস্থা		
নিরাপদ খাবার পানি পান করে কি না	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৭৬	৭৬
না	৫	৫
মাঝে মাঝে	১৯	১৯
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১৭

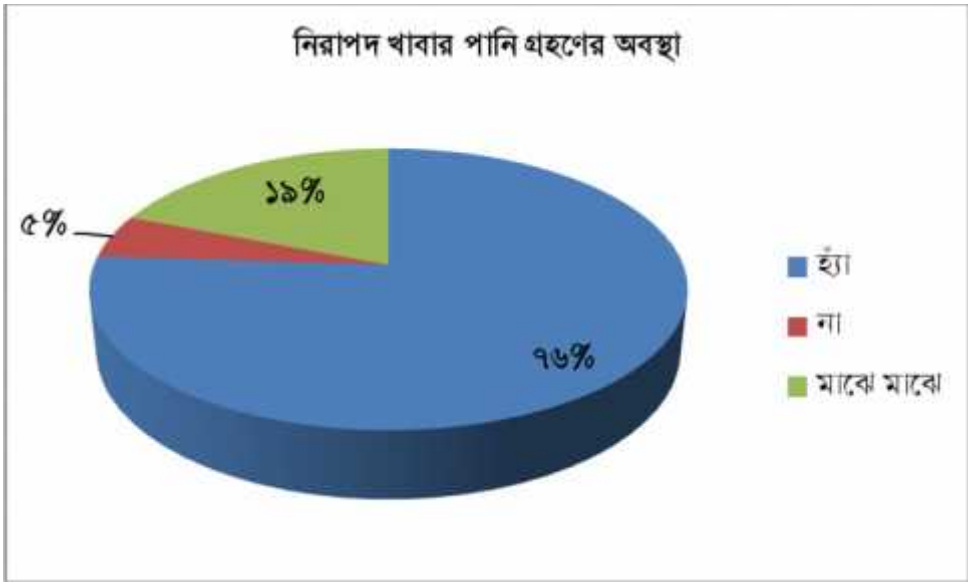

সংস্থার সদস্যদের নিরাপদ পানি গ্রহণের চিত্রে দেখা যায়, ৭৬ শতাংশ সদস্যের পরিবার নিরাপদ পানি পান করে। বাকি ৫ শতাংশ নিরাপদ পানি পান করে না এবং ১৯ শতাংশ নিরাপদ পানি পানের ক্ষেত্রে অনিয়মিত।

সারণি ৫.২২ নিরাপদ পানি ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)		
সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সমিতি/সংস্থা থেকে	৩৫	৩৫
টেলিভিশন/ রেডিও থেকে	৬৫	৬৫
অন্যান্য	৫২	৫২

লেখচিত্র- নং: ১৮

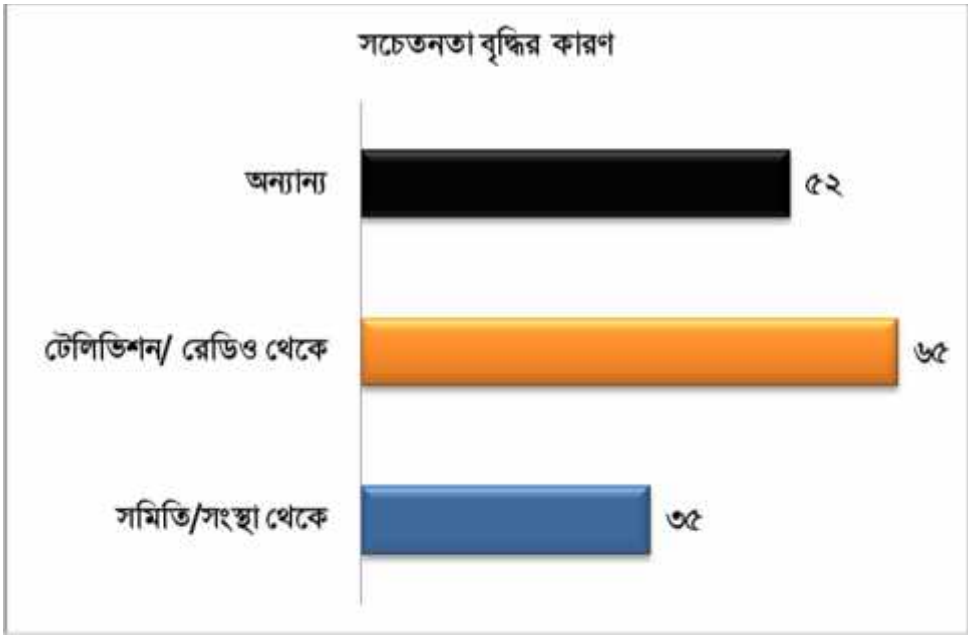

নিরাপদ পানি গ্রহণের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে সংস্থার প্রভাব বা সংস্থার মাধ্যমে সচেতন হয়েছে ৩৫ শতাংশ। তাছাড়া রেডিও, টেলিভিশন বা গণমাধ্যমের প্রচার, প্রচারণায় সচেতন হয়েছে ৬৫ শতাংশ এবং অন্যান্যভাবে সচেতন হয়েছে ৫২ শতাংশ। সদস্যরা সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। যেখানে তারা এ বিষয় জানতে পারে। তাছাড়া সংস্থার পক্ষ থেকেও তাদেরকে নিরাপদ পানি গ্রহণের জন্য সচেতন করা হয়। তবে সামাজিক জীবনে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা বাড়ার কারণে এখন অধিকাংশ মানুষ গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সরকার ও বেসরকারি সংস্থা সমূহ সামাজিক জীবনের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সচেতনতামূলক

তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার করে থাকে। ফলে এর দ্বারা মানুষ সচেতন হচ্ছে। তবে এনজিওরা নিজ উদ্যোগে তাদের সদস্যদেরকে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয় উপস্থাপন করে।

সারণি ৫.২৩ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা		
চিকিৎসা গ্রহণ প্রবণতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৮৯	৮৯
কমেছে	০	০
একই আছে	১১	১১
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ১৯

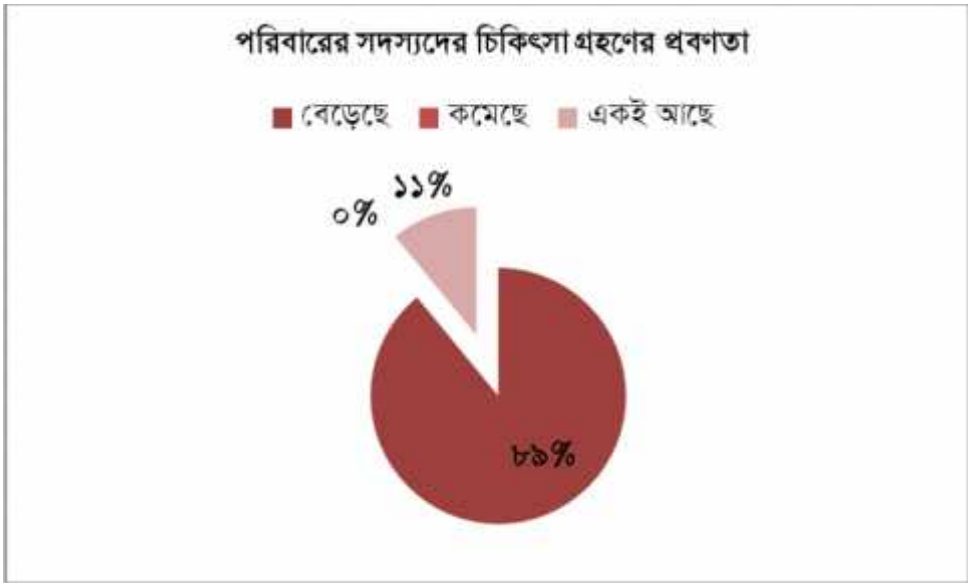

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। অর্থ, সচেতনতা বা সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেক সময় গরিব মানুষ এই মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে নারীদের চিত্র আরও করুন। এনজিওতে অংশগ্রহণ করার ফলে নারীদের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ প্রবণতা কতটা বেড়েছে সে প্রশ্নের তথ্যে দেখা যায়, শতকরা ৮৯ ভাগের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই রকম আছে ১১ শতাংশের। উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনায় দেখা যায়, সংস্থার প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ, পরিবারের বাইরে যাওয়া, অন্যান্য নারীদের সাথে চলাফেরা ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে।

সারণি ৫.২৪ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)		
চিকিৎসা গ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সংস্থার প্রভাব	৫৫	৫৫
মিডিয়ার প্রভাব	৫২	৫২
বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়	৪৩	৪৩
সামর্থ্য বেড়েছে	৩৫	৩৫
সামাজিক সচেতনতা	৪৯	৪৯
কাছাকাছি হাসপাতাল আছে	৫৪	৫৪
অন্যান্য	৪৬	৪৬

লেখচিত্র- নং: ২০

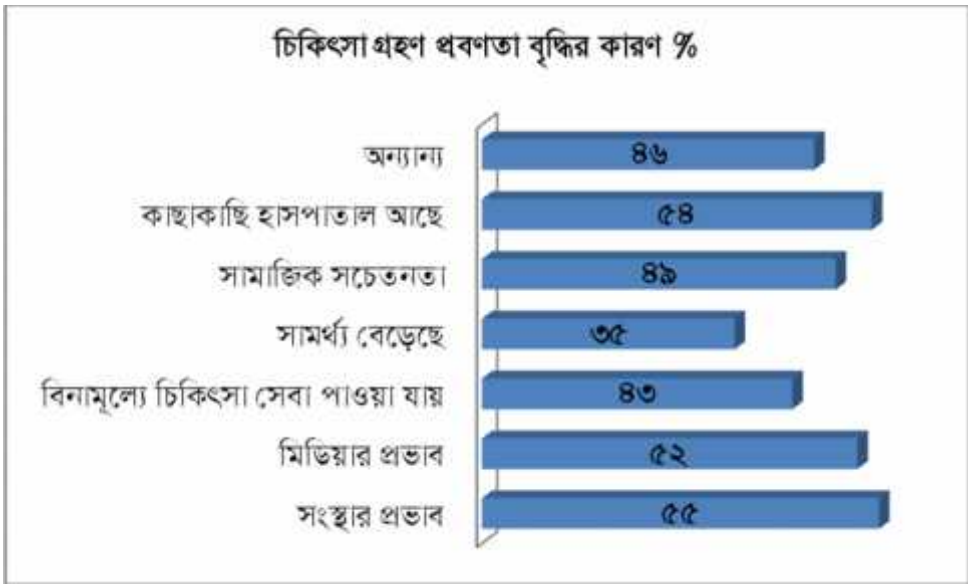

চিকিৎসা প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উপকারভোগীদের সচেতনতা বেড়েছে, সংস্থার প্রভাব, মিডিয়ার প্রভাব, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়, সামর্থ্য বেড়েছে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কাছাকাছি হাসপাতাল আছে ইত্যাদি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ সদস্যের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থার কর্মীদের আলোচনা, সচেতনতামূলক আলোচনা, একই সাথে বিভিন্ন পেশার নারীদের সাথে আলোচনা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, দেখা যাচ্ছে সংস্থার প্রভাবে ৫৫ শতাংশ সদস্যের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ৬২ সদস্য মিডিয়া বা গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অর্থাৎ টেলিভিশন ও রেডিওর প্রভাবে

তারা সচেতন হয়েছে। সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে বিতরণকৃত বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধও তাদের চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী করেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্য বাড়ার কারণেও তাদের মধ্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩৫ শতাংশ সদস্য তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির কারণে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে আগ্রহী হয়েছে। সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, সংকট, দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েও সমাজের মানুষ এখন যথাসময়ে চিকিৎসা সেবা নিতে আগ্রহী হয়েছে। এছাড়া হাতের নাগালে হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠায় নারীরা আগের চেয়ে একটু বেশি সচেতন তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে।

সারণি ৫.২৫ চিকিৎসায় গুরুত্ব প্রদান		
চিকিৎসায় গুরুত্ব প্রদান	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ	২০	২০
নারী	১৫	১৫
সবাইকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়	৬৫	৬৫
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২১

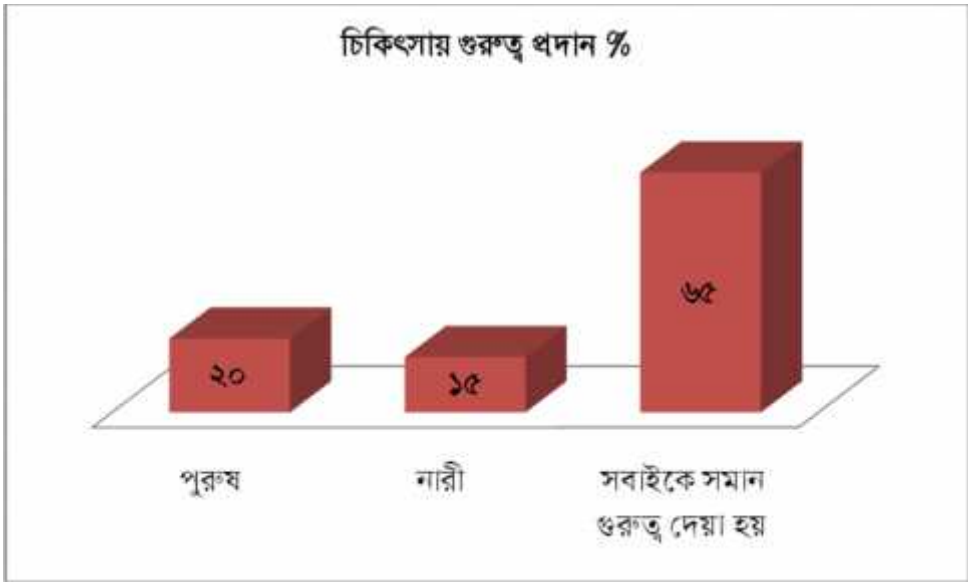

পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসায় আগে নারীর তুলনায় পুরুষদের গুরুত্ব প্রদান করা হত। কিন্তু বর্তমানে এনজিওর সঙ্গে যুক্ত নারীদের এ চিত্র বদলেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্র্যাকের শতকরা ৬৫ শতাংশ সদস্যের পরিবারেই সবার জন্য চিকিৎসা সেবার সমান ব্যবস্থা করা হয়। তবে ২০ শতাংশ পরিবারে পুরুষকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ১৫ শতাংশ পরিবারে নারীকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। আগে যেখানে নারীর চিকিৎসা সেবার ব্যাপারে পরিবার থেকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হত না সেখানে এখন ৬৫ শতাংশ পরিবারের নারী সমান গুরুত্ব পায় এবং ১৫ শতাংশ পরিবারে নারীকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে দেখা যাচ্ছে এখনও কিছু পরিবারে পুরুষকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে পুরুষকে গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা পূর্বের তুলনায় বেশ কমেছে। এক্ষেত্রে এনজিওদের প্রচারণা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে এনজিওদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ধরে নেয়া যায়।

সারণি ৫.২৬ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা		
স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৬৩	৬৩
কমেছে	০	০
একই আছে	৩৭	৩৭
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২২

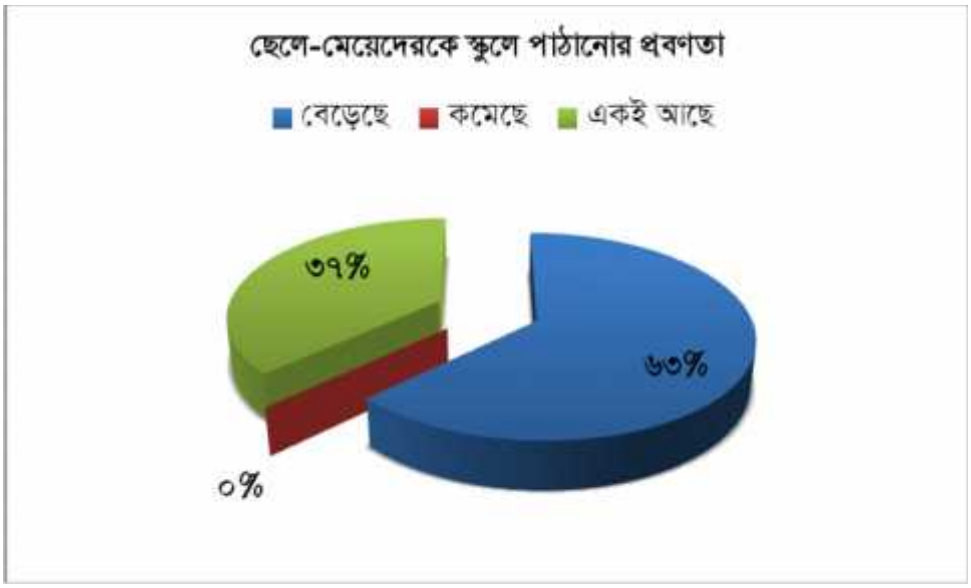

শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করনে সরকার এখন পর্যন্ত এককভাবে ব্যবস্থা করতে পারছে না। এনজিওগুলো তাই সরকারের সহযোগী হিসেবে দেশে শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। উপরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এনজিওর সাথে জড়িত নারীদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা পূর্বের তুলনায় ৬৩ শতাংশের বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সাথে আলোচনায় দেখা যায়, সংস্থা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। তাছাড়া সামাজিকভাবেই শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় এনজিও সুবিধাভোগীরা বিভিন্নভাবে এক্ষেত্রে উৎসাহিত হচ্ছে।

সারণি ৫.২৭ ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)		
স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সংস্থার প্রভাব/ সংস্থা বিনামূল্যে বই দেয়	৬৪	৬৪
কাছাকাছি প্রাইমারি স্কুল আছে	৫৯	৫৯
সংস্থার স্কুল আছে	২৯	২৯
সামাজিকভাবে শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েছে	৪৩	৪৩

লেখচিত্র- নং: ২৩

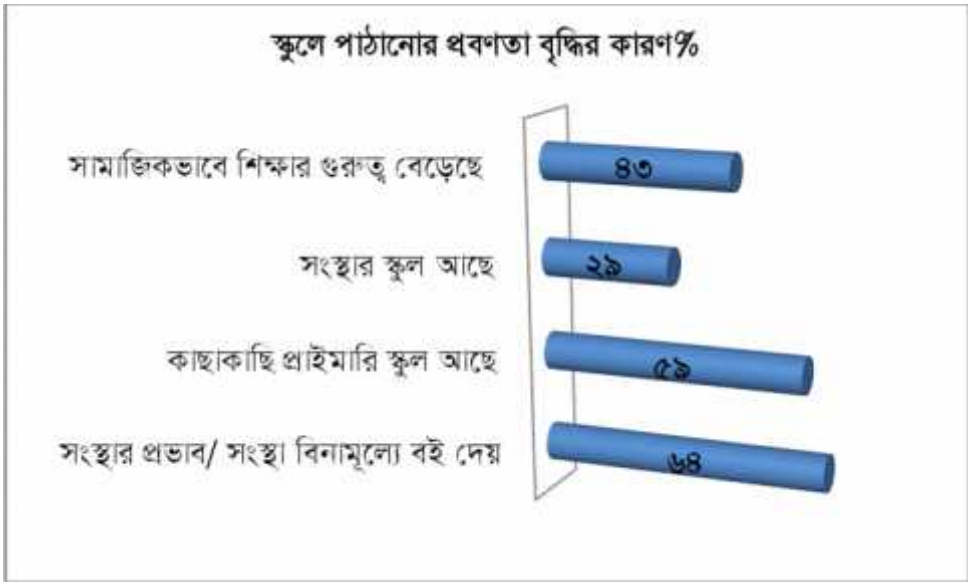

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, উপকারভোগীদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংস্থার প্রভাব, সামাজিক সচেতনতা ও সামাজিকভাবে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন, কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা এবং সংস্থার স্কুল থাকা বিষয়গুলো প্রভাব ফেলেছে। দেখা যাচ্ছে ৬৪ শতাংশ সদস্য তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পূর্বে তুলনায় আগ্রহী হয়েছেন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে। সংস্থা সচেতনতা মূলক কর্মসূচি, সংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রদান, শিক্ষার প্রতি সংস্থার গুরুত্ব প্রদান, সংস্থার স্কুল স্থাপন এ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২৯ শতাংশ সুবিধাভোগী তাদের সন্তানদেরকে সংস্থার স্কুলে পাঠান। ফলে দেখা যায়, সংস্থার মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে অধিকাংশ সুবিধাভোগী আগ্রহী হয়েছেন। এছাড়া সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা, শিক্ষিত মানুষের সামাজিক মর্যাদা, ভালো কর্মসংস্থান, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি কারণে পরিবারগুলো আগের তুলনায় সন্তানদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ৪৩ শতাংশ সদস্য তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি হওয়ায় ৫৯ শতাংশ সদস্য সন্তানকে স্কুলে পাঠান। তবে সার্বিক চিত্রে স্পষ্ট হয় যে, সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা এনজিওদের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন।

সারণি ৫.২৮ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৬২	৬২
কমেছে	০	০
একই রকম আছে	৩৮	৩৮
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২৪

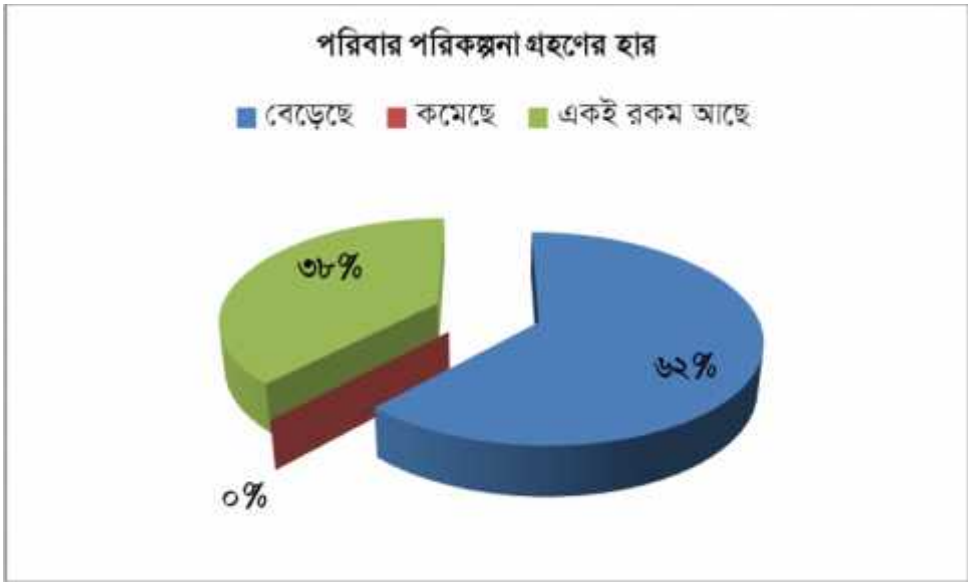

বাংলাদেশ সরকার পরিবার-পরিকল্পনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে যাতে পরিবারগুলো ছোট থাকে। এনজিওগুলো সরকারের সহায়ক হিসেবে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার সদস্য হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হারে দেখা যায়, সংস্থার ৬২ শতাংশ সদস্য বা তার পরিবারে পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই রকম আছে ৩৮ শতাংশ সদস্যের পরিবারে। তবে ৬২ শতাংশ পরিবারে পরিবার-পরিকল্পনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা একেবারেই কম নয়।

সারণি ৫.২৯ দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধির কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সংস্থার কর্মীদের কাছ থেকে পদ্ধতির সুফল জানতে পারি	৩৫	৩৫
রেডিও/টেলিভিশনের প্রচারণা	৪৬	৪৬
স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করে পদ্ধতি গ্রহণ করি	১২	১২
সরকারিভাবে বিনামূল্যে পাওয়া যায়	৫২	৫২
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে	৩৫	৩৫

পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, সংস্থার কর্মীদের কাছ থেকে পদ্ধতির সুফল জানতে পারা, রেডিও-টেলিভিশনের প্রচারণা, স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করে পদ্ধতি গ্রহণ, সরকারিভাবে বিনামূল্যে উপকরণ প্রাপ্তি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে

দেখা যায়, সংস্থা থেকে বিভিন্ন ভাবে সচেতন হয়েছে ৩৫ শতাংশ সদস্য। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যম রেডিও ও টেলিভিশন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে অধিকাংশ সদস্য পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করছে। তবে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এনজিওদের প্রচার-প্রচারণায় স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করে পদ্ধতি গ্রহণ করে ১২ শতাংশ সদস্য। তবে সরকারিভাবে বিনামূল্যে উপকরণ পাওয়ার কারণে ৫২ শতাংশ সদস্য পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের থেকে জানা যায়, পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি এবং নারীদের সচেতন করার ব্যাপারে এনজিও ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এক সময় ছিল যখন বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতা তথা সরকারি খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে দরিদ্রদের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। অসচেতনতার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাধারণভাবে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। অসচেতনতার ফলে তাদের রোগ বেশি, সন্তান বেশি, অশিক্ষা বেশি। তবে এনজিওদের প্রচার-প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র নারী ও তাদের পরিবার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি লাভ করছে।

৫.১.৬ উপকারভোগীদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশের সংবিধানে বল হয়েছে, নারী পুরুষ সমান। কিন্তু নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতার সঠিক বিকাশের অভাবে নারী পশ্চাৎপদ শ্রেণিতে পরিণত হয়ে আছে। এনজিওরা মূলত নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতার সঠিক বিকাশের মাধ্যমে তাকে স্বাবলম্বী এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশে এনজিও পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় যে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, সুদের হার কমানো, নারীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে শেখানো, মহিলাদের জন্য আইনি সহায়তা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ এনজিওরা গ্রহণ করেছে।

এ অংশে উপকারভোগীদের ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশে এনজিও পদক্ষেপ, পরবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ, বাড়ির বাইরে চলার স্বাধীনতা, সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত, আয়ের টাকা খরচ ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৫.৩০ সদস্য হওয়ার ফলে বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা		
বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৭৩	৭৩
কমেছে	০	০
একই রকম আছে	২৭	২৭
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২৫

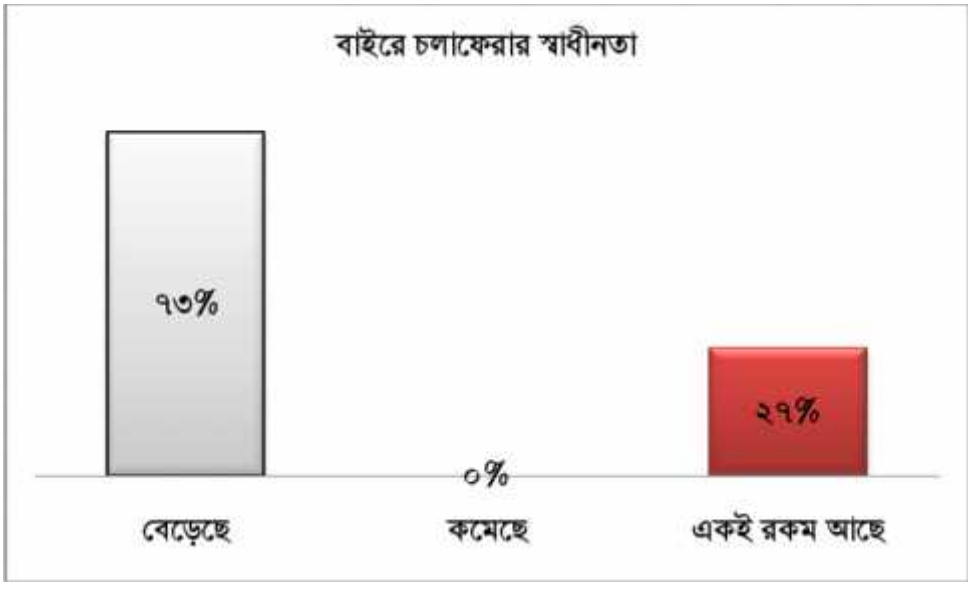

এক সময় নারীদেরকে ঘরের আবদ্ধ থাকতে হত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে নারীরা কাজের প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারছে। এ ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা কম নয়। কেননা এনজিওদের কর্মপদ্ধতিই হচ্ছে নারীকে সংস্থার কার্যক্রমে অংশ নিতে বাড়ির বাইরে যেতে হবে। ঋণ গ্রহণ, সমিতির সাপ্তাহিক সভা, ট্রেনিং সবকিছুর জন্যই বাইরে আসতে সংস্থার সাথে জড়িত নারীদের। ফলে দেখা যাচ্ছে ৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা বাড়ির বাইরে যেতে পারছে। এতে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা নেই। তবে ২৭ শতাংশ উত্তরদাতার অবস্থা আগের মত। অর্থাৎ বাড়ির বাইরে যেতে তারা বাঁধার সম্মুখীন হন। তবে সময়ের ব্যবধানে এ হার কমেছে। এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে নারীরা অনেক স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। তারা ক্ষমতায়িত হচ্ছে।

সারণি ৫.৩১ সদস্য হওয়ার ফলে বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)

বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজের প্রতি আস্থা বেড়েছে	৪৬	৪৬
নিজের প্রতি পরিবারের আস্থা বেড়েছ	৩০	৩০
স্বাবলম্বী হতে হলে বাইরে যেতে হবে	২৬	২৬
সংস্থার কর্মীদের সহায়তা	২০	২০
সামাজিক পরিবর্তন আসছে	৬৮	৬৮
অন্যান্য	৩৪	৩৪

লেখচিত্র- নং: ২৬

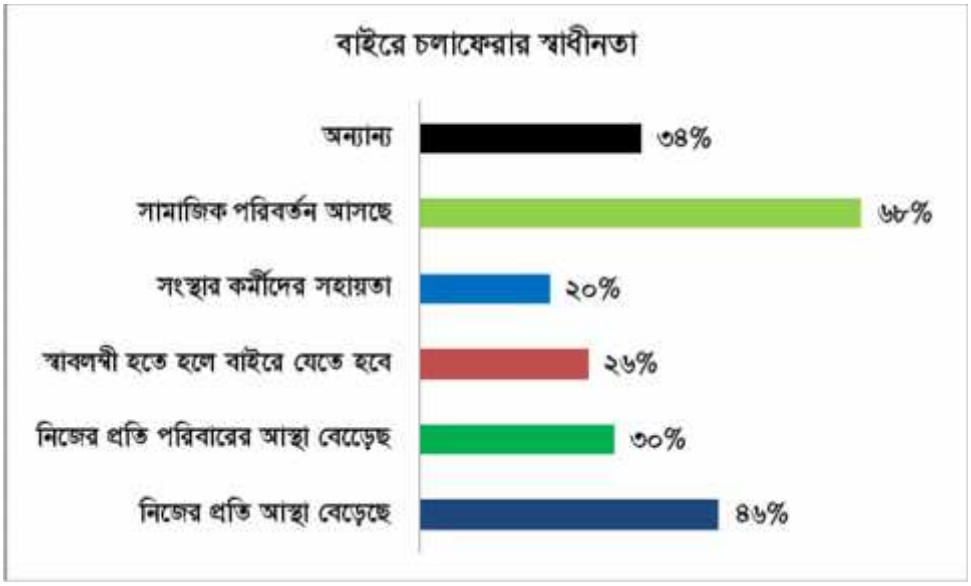

উপকারভোগী নারীদের বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কিত তথ্যে নিজের প্রতি আস্থা বেড়েছে, সদস্যের প্রতি পরিবারের আস্থা বেড়েছে, সংস্থার কর্মীদের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকভাবেই নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় সমস্যা কমে গেছে। এখন বাইরে যেতে তাদেরকে তেমন বাঁধা দেয়া হয় না। ফলে ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন সামাজিক পরিবর্তনের কথা। তবে দেখা যাচ্ছে সংস্থার সদস্য হওয়ার পর নিজেদের প্রতি আস্থা বেড়েছে ৪৬ শতাংশ সদস্যের। তাছাড়া সদস্যদের পরিবার তাদের প্রতি আস্থা পেয়েছে ৩০ শতাংশ পরিবারে। এছাড়া স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে সংস্থা ও সংস্থার সদস্যরা তাদেরকে সচেতন করে ২০ শতাংশ। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হলে বাইরে যাওয়া বিকল্প নেই মনে করে ২৬ শতাংশ। সুতরাং বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এনজিওদের প্রভাব ব্যাপকভাবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে উলে- খিত তথ্যে।

সারণি ৫.৩২ সংস্থার সদস্য হওয়ার পর পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৬৮	৬৮
কমেছে	০	০
একই রকম আছে	৩২	৩২
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২৭

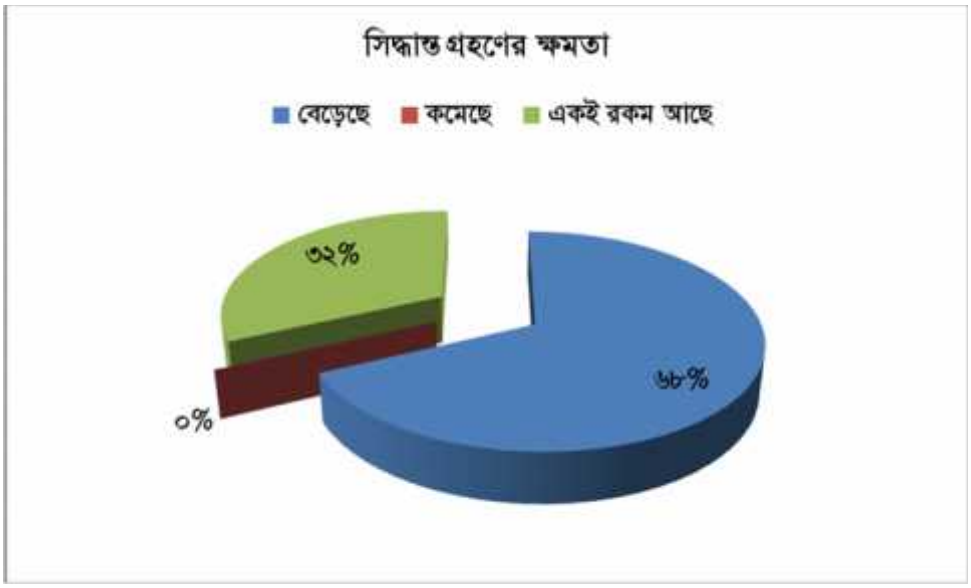

এনজিওরা শুধুমাত্র নারীদের আয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করে না, পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তাদের ক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও কাজ করে। সারণির তথ্য অনুযায়ী সমিতির সদস্য হওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে ৬৮ শতাংশের। তবে একই রকম আছে ৩২ শতাংশের। দেখা যাচ্ছে সংস্থার সদস্য হওয়ার পর সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৫.৩৩ পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)		
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঋণ নেয়ার ফলে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৩	৪৩
সমিতির বিভিন্ন সভায় যোগদানের ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি	৫৫	৫৫
প্রশিক্ষণের ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	১৪	১৪
আয় বেড়েছে	৩২	৩২
সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন	২৫	২৫

লেখচিত্র- নং: ২৮

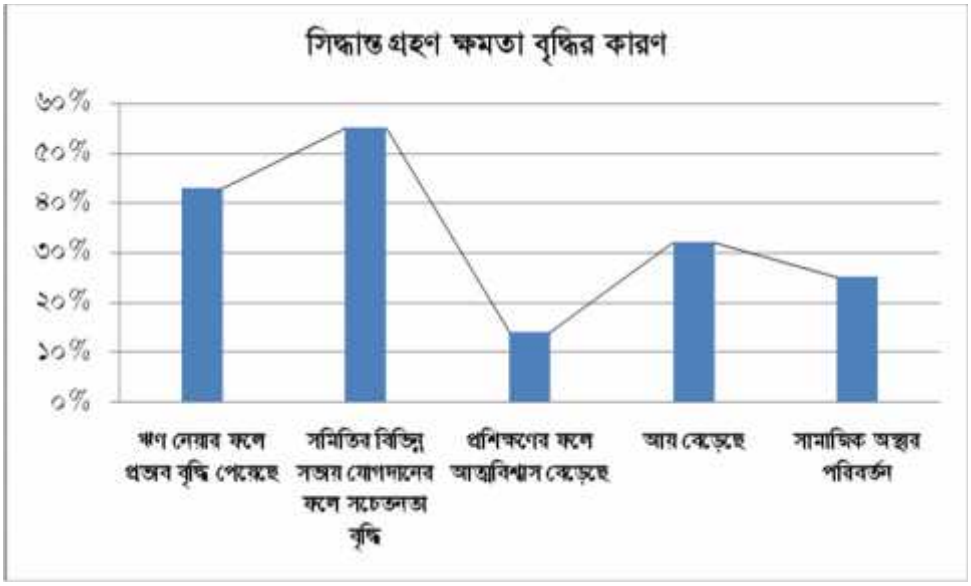

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, উত্তরদাতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আয় বৃদ্ধি, ঋণ নেয়ার ফলে সংসারে প্রভাব বৃদ্ধি, সংস্থায় যোগদানের ফরে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় কাজ করেছে। দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৪৩ শতাংশ সদস্যের প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি কাজ করেছে। অর্থাৎ তারা পরিবারে অর্থের ব্যবস্থা, নতুন করে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পেরেছে বিধায় তাদের সিদ্ধান্তে তাদের ভূমিকা বেড়েছে। আবার সমিতির বিভিন্ন সভায় যোগদানের ফলে ৫৫ সদস্যের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্যরা আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, ফলে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া আয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেও সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা বেড়েছে। তবে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনও ভূমিকা রাখছে। সার্বিকভাবে সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ঋণ, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির ও তার প্রভাবে সদস্যদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৫.৩৪ সন্তান ধারণে প্রভাব (একাধিক উত্তর)		
প্রভাব	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্বামীর ইচ্ছায়	২৫	২৫
উভয়ের ইচ্ছায়	৫৮	৫৮
শাশুড়ি/শ্বশুরের ইচ্ছায়	২	২
আল□াহর দান	১৫	১৫
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ২৯

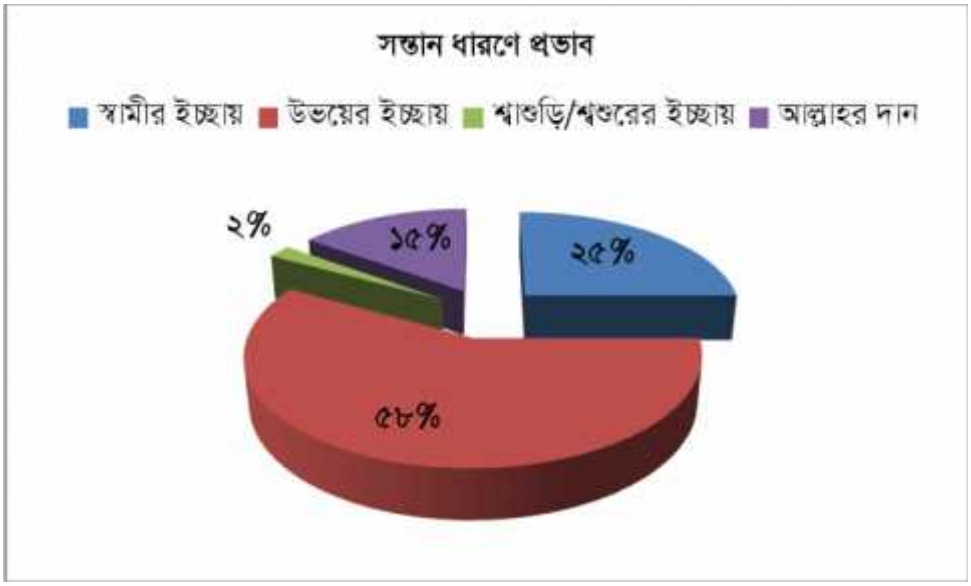

সন্তান ধারণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতির বিষয়। কিন্তু অশিক্ষা, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, সামাজিক অবস্থা, সচেতনতার অভাবে নারী এক্ষেত্রে অনেক আগে থেকেই পিছিয়ে পড়েছে। তবে বর্তমানে এ অবস্থার অনেক উন্নতি হচ্ছে ও হয়েছে। এখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তান গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন, সরকারি ও বেসরকারি প্রচারণা, দারিদ্র্যের কারণ প্রচার, শিক্ষার প্রভাবে বর্তমানে এক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। দেখা যাচ্ছে, ৫৮ শতাংশ সদস্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তবে স্বামীর ইচ্ছা প্রাধান্য পায় এখনও ২৫ শতাংশ পরিবারে। তাছাড়া ২ শতাংশ পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়ির মতামত প্রাধান্য পায়, আবার দেখা যাচ্ছে ১৫ শতাংশ পরিবারে ধর্মীয় মতবাদ প্রাধান্য পায়। তবে সার্বিকভাবে দেখা যায়, সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে সনাতন ধ্যান ধারণা ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। কেননা স্বামীর একক সিদ্ধান্ত, শ্বশুর-শাশুড়ির মতামত ও ধর্মীয় ধ্যান ধারণার প্রভাব কমে এসেছে। বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সিদ্ধান্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা অবশ্যই ইতিবাচক একটি চিত্র। নারীরা পরিবারের বাইরে যেয়ে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ নিয়ে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে, সচেতন হয়ে সন্তান ধারণে স্বামীর পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নিতে সচেষ্ট হচ্ছে, যেখানে এনজিওর ভূমিকা অনেক।

সারণি ৫.৩৫ আয়ের টাকা কার হাত দিয়ে খরচ হয় (একাধিক উত্তর)		
আয়ের টাকা কার হাত দিয়ে খরচ হয়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজেই খরচ করতে পারে	২৮	২৮
স্বামী খরচ করে	২১	২১

সংসারের প্রয়োজনে দু'জনেই খরচ করি	১৯	১৯
শাশুড়ি/শ্বশুর/সন্তান খরচ করে	৮	৮
আয় নেই	২৪	২৪
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৩০

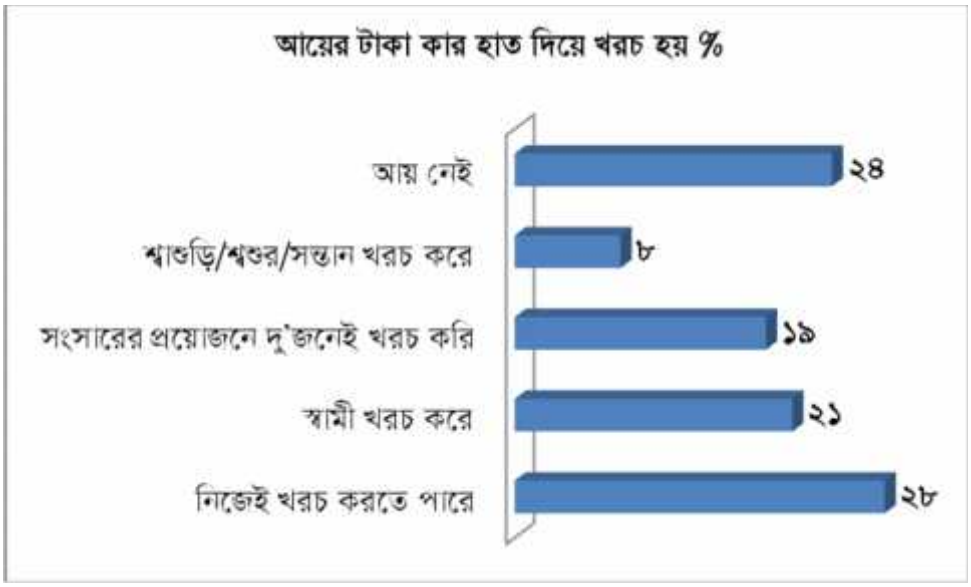

টাকা শুধু আয় করাই নয়, তা খরচ করার সামর্থ্য এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ক্ষমতায়নের প্রধান শর্ত বলে মনে করা হয়। উপরের তথ্য অনুযায়ী আয় করতে পারা ৭৬ শতাংশ সদস্যের মধ্যে ২৮ শতাংশ সদস্য নিজের ইচ্ছায় তার অর্জিত টাকা খরচ করতে পারে। তবে ২১ শতাংশ সদস্যের স্বামী সদস্যের আয় খরচ করেন। তবে সংসারের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খরচ করে ১৯ শতাংশ সদস্যের পরিবারে। এছাড়া ৮ শতাংশ সদস্যের শাশুড়ি, শ্বশুর, সন্তান তাদের আয় খরচ করেন। দেখা যাচ্ছে নিজে খরচ করা এবং সংসারের প্রয়োজনে উভয়ে খরচ করার হারে নারীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিবারে নিজের আয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এক্ষেত্রে এনজিওদের ঋণ কার্যক্রমের ইতিবাচক ভূমিকার দিকটি মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এনজিওরা নারীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ধরে নেয়া হয়েছিল যে, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি আসলেই অন্যান্য সমস্যা মিটে যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া

সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এনজিওরা নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয় এবং তাদেরকে পরিবারে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হতে প্রস্তুত করে তোলে।

৫.১.৭ উপকারভোগীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

আবহমানকাল ধরে নারী যে প্রজনন ভূমিকা পালন করে আসছে, সমাজ নারীকে সেই ভূমিকায় সব সময় দেখতে চায়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, সাথে সাথে নারীর প্রজনন ভূমিকারও পরিবর্তন হয়েছে। সন্তানধারণ ও প্রসব এ দুটি প্রাকৃতিক নিয়ম পালন ছাড়া অন্যান্য যেসব কাজ যেমন- সন্তান যত্ন, লালন-পালন, ঘর-গৃহস্থলীর কাজকর্ম ইত্যাদি পরিবারের সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নেয়ার সময় এসেছে। এ অংশে উপকারভোগীদের এনজিওর সাথে সম্পৃক্ততার ফলে কাজের চাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস, এর কারণ, নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ কর হয়েছে।

সারণি ৫.৩৬ সদস্য হওয়ার পর পরিবারে কাজের চাপের অবস্থা

কাজের চাপের অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেড়েছে	৫৩	৫৩
কমেছে	০	০
একই রকম আছে	৪৭	৪৭
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৩১

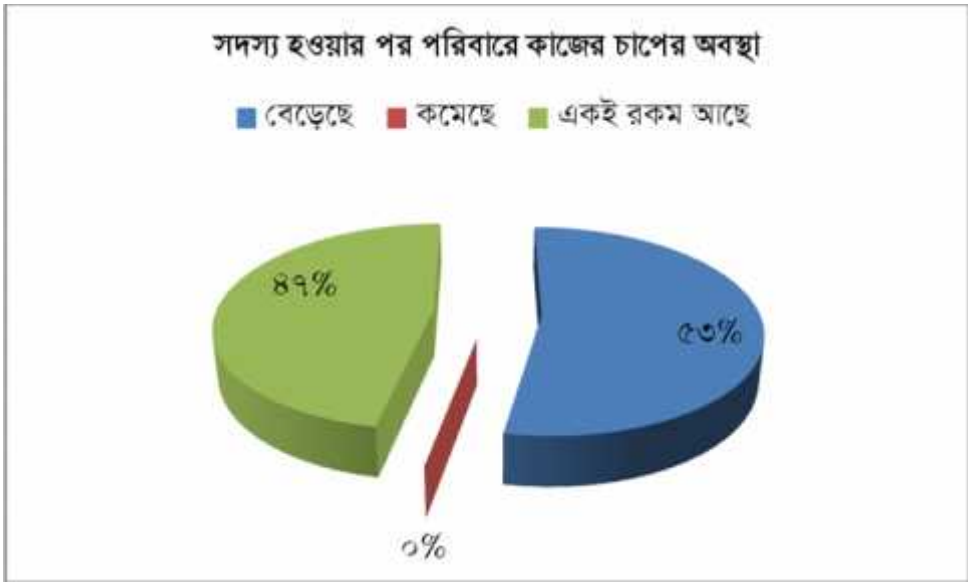

এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে উপকারভোগী গৃহিণী কর্মজীবী নারীদের কারো কারো ক্ষেত্রে কাজের চাপ বেড়েছে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, ৫৩ শতাংশ সদস্যের কাজের চাপ বেড়েছে। তবে ৪৭ শতাংশ সদস্য মনে করে তাদের কাজের চাপ পূর্বের তুলনায় বাড়েনি বরং একই অবস্থায় আছে।

সারণি ৫.৩৭ পরিবারে কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণ (একাধিক উত্তর)		
কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঘরে-বাইরে কাজ করতে হয়	৪৫	৪৫
পরিবারের সদস্যরা অতিরিক্ত কোন কাজ করে না	২৪	২৪
সংস্থার কাজে সময় দিতে হয়	২০	২০
অন্যান্য	২৯	২৯
একই রকম আছে	৪৭	৪৭

উত্তরদাতার উপর কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ঘরে বাইরে দু'জায়গাতেই কাজ করতে হয়, পরিবারের সদস্যরা অতিরিক্ত কোন কাজ করে না, সংস্থার কাজে সময় দেয়ার ফলে চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায়। এনজিওর সাথে জড়িত নারীরা বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে জড়িত হচ্ছে। ফলে তারা বাইরে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু তাদেরকে ঘরের কাজে আগের মতই সময় দিতে হচ্ছে। উত্তরদাতা সদস্যদের ৪৫ শতাংশই ঘরে বাইরে কাজ করার কারণে কাজের চাপ বেড়েছে। তবে সংস্থার কাজে সময় দিতে হয় বিধায় কাজের চাপ বেড়েছে বলে মনে করেন ২০ শতাংশ। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অতিরিক্ত কোন কাজ করে না বিধায় ২৪ শতাংশ সদস্য মনে করে তাদের কাজের চাপ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে নারীকে ঘরে বাইরে সমানভাবেই কাজ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা তেমন কোন সহায়ক ভূমিকা রাখছে না।

সারণি ৫.৩৮ নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি		
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬৫	৬৫
একই রকম আছে	৩৫	৩৫

মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৩২

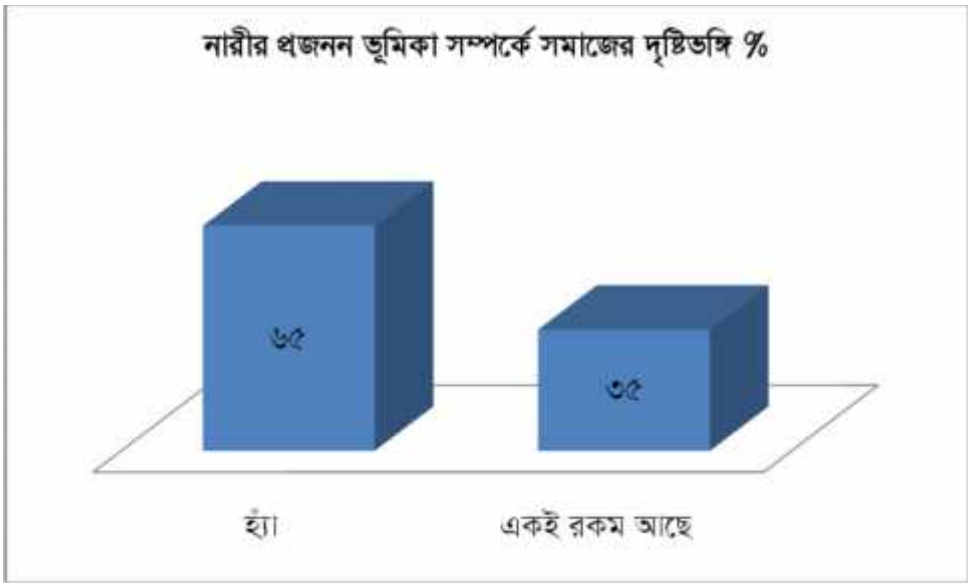

সময়ের সাথে সাথে এখন নারীকে ঘরে-বাইরে দু' জায়গাতেই কাজ করতে হয়ে। এক সময় পরিবারে অবস্থান করলেও এখন তাকে পরিবারের জন্যই বাইরে যেতে হয়। তবে দীর্ঘদিন দিন ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ করেই বদলে যাবে তা ভাবা যায় না। তথ্যে দেখা যাচ্ছে ৬৫ শতাংশ সদস্যের মতামত হচ্ছে নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তবে ৩৫ শতাংশ সদস্যের মন্তব্য হচ্ছে নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম আছে অর্থাৎ কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে এক সময় যেখানে নারীকে মনে করা হত নারী ঘরে থাকবে, এখন সেখানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এনজিওদের কার্যক্রম শুরু করার প্রথম দিকে দেখা যেত সমাজ নেতা, ধর্মীয় নেতা ইত্যাদি লোকেরা এনজিওর সাথে জড়িত হলে নারীদের এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিত, অত্যাচার করত। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন থেকে জানা যায়, সমাজের ফতোয়া প্রদান, বাঁকা কথা বলা ইত্যাদি প্রবণতা কমেছে। আগে ধর্মীয় নেতারা এনজিও কার্যক্রমের বিরুদ্ধাচরণ করলেও বর্তমানে নারীদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া নিয়ে সমস্যা হয় না।

সারণি ৫.৩৯ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ক্ষেত্র (একাধিক উত্তর)		
দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ক্ষেত্র	সংখ্যা	শতকরা হার (%)

পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে	৪৫	৪৫
বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না	৩৪	৩৪
পরিবারের সদস্যরা বাচ্চার দেখাশোনা করে	৪৬	৪৬
বাইরের কাজে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে	৩৫	৩৫
অন্যান্য পরিবারেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে	২৬	২৬

নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, আগের তুলনায় পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে কিছুটা সহযোগিতা করছে, বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের বাঁধা কমেছে, বাচ্চার দেখা শুনায় অন্যান্যদের সহযোগিতা বেড়েছে, বাইরের কাজে ধর্মীয় বাঁধা কমেছে, অন্যান্য পরিবারগুলোতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়ায় সদস্যদের পরিবারগুলোতে পরিবর্তন আসছে অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে ৪৫ শতাংশ সদস্যের। বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ থেকে কোন বাধা নেই ৩৪ শতাংশের ক্ষেত্রে, সন্তান দেখাশোনার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সহযোগিতা করছে ৪৬ শতাংশ সদস্যকে, বাইরের কাজে ধর্মীয় বিধি নিষেধ তেমন নেই ৩৫ শতাংশের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ২৬ শতাংশের ক্ষেত্রে।

সারণি ৫.৪০ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়া চিত্র (একাধিক উত্তর)		
দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়ার চিত্র	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে না	২১	২১
বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়	২৫	২৫
পরিবারের সদস্যরা বাচ্চার দেখাশোনা করে না	১৯	১৯
বাইরের কাজে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি	২৪	২৪
নির্যাতনের শিকার হতে হয়	১২	১২

এর আগে আমরা দেখেছি ৩৫ শতাংশ পরিবারে এখনও নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি ৩৫ শতাংশ পরিবারে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে না ২১ শতাংশের, বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় ২৫ শতাংশের বাচ্চা দেখা শুনায় অন্যদের ভূমিকা নেই ১৯ শতাংশের পরিবারে, বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি ২৪ শতাংশের। নির্যাতনের শিকার হতে হয় ১২ শতাংশে সদস্যকে।

৫.১.৮ উপকারভোগীদের উন্নয়নের জন্য সুপারিশ

সারণি ৫.৪১ ঘরে সময় না দিয়ে বাইরে দিলে উপার্জন করতে পারা যেত কি না

উপার্জন করার সক্ষমতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৭৬	৭৬
না	২৪	২৪
মোট	১০০	১০০

লেখচিত্র- নং: ৩৩

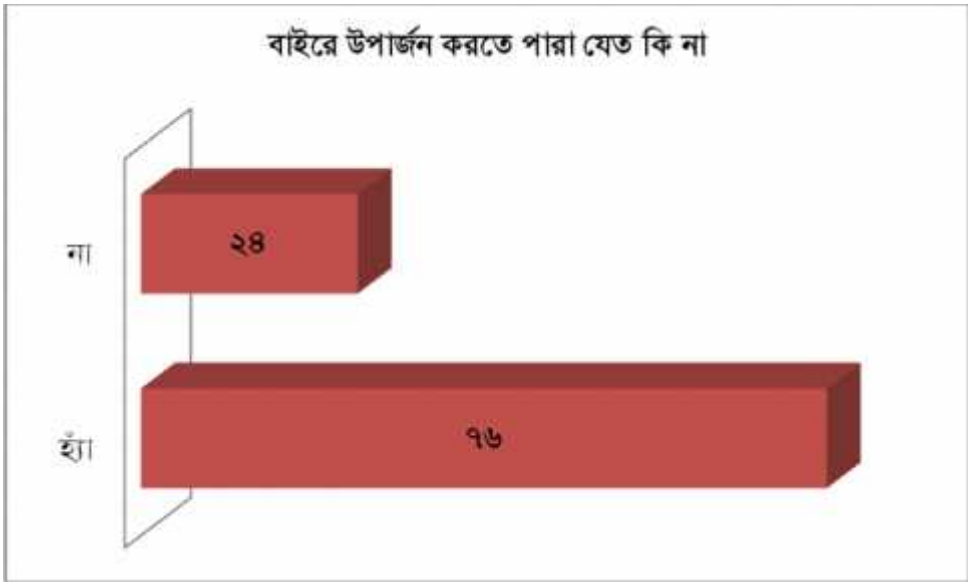

নারীরা ঘরের কাজে যে সময় ব্যয় করে তার কোন মূল্যায়ন হয় না। এই ঘরের কাজে ব্যয় করা সময় নারীরা যদি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করত তাহলে অনেক বেশি টাকা উপার্জন করতে পারত। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ব্র্যাকের শতকরা ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তার ঘরের কাজে যে সময় ব্যয় করেন তা বাইরে ব্যয় করলে উপার্জন করতে পারতেন। তবে ২৪ শতাংশ সদস্য মনে করে তারা উপার্জন করতে পারতেন না বলে মনে করেন। তবে দেখা যাচ্ছে, নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে যে, তারা ঘরে যে সময় দেয়া তার কোন মূল্য দেয়া হচ্ছে না; অথচ তাদের কাজের মূল্য রয়েছে। এর ফলে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত।

সারণি ৫.৪২ বাইরে সময় দিলে উপার্জন করার ক্ষেত্র

উপার্জন করার ক্ষেত্র	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ব্যবসা করা	১৫	১৫
শ্রমিক হিসেবে শ্রম দেয়া	৩৫	৩৫
চাকুরি করা	৪০	৪০
চাষাবাদ	১৫	১৫
অন্যান্য কর্মসংস্থান	২৫	২৫

লেখচিত্র- নং: ৩৪

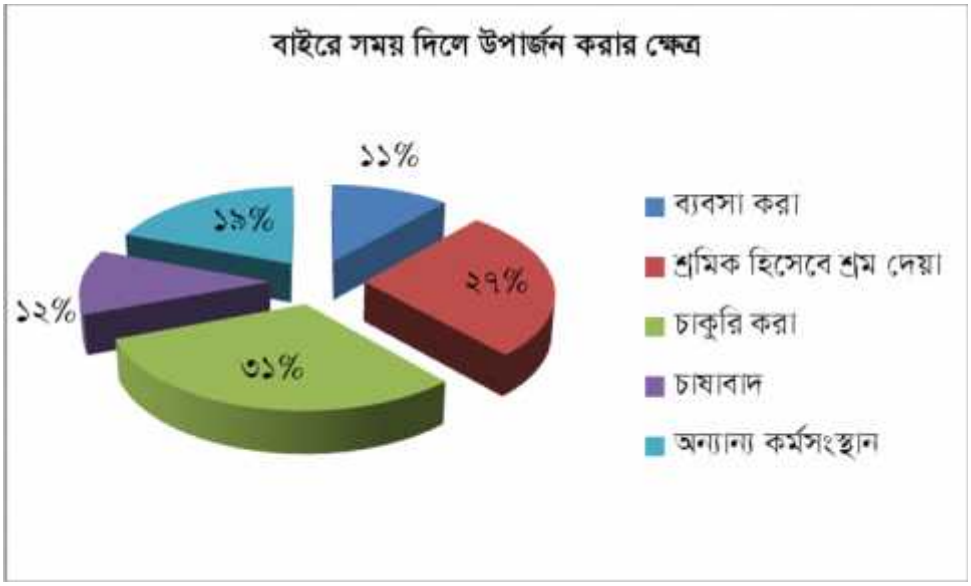

উত্তরদাতারা বাইরে সময় দিলে কোন কোন কোন খাত থেকে উপার্জন করতে পারত এ সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, ব্যবসায় সময় দেয়া, শ্রমিক হিসেবে সময় দেয়া, চাকুরি করা, চাষাবাদ করা, অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসংস্থান করে নেয়ার কথা এসেছে। তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ১৫ শতাংশ সদস্য ব্যবসার কথা বলেছেন। ৩৫ শতাংশ সদস্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রম দেয়ার কথা বলেছেন, ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা চাকুরির কথা বলেছেন। ১৫ শতাংশ উত্তরদাতা কৃষি কাজের কথা বলেছেন এবং ২৫ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য কর্মসংস্থানের কথা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিবারের বাইরে অন্যান্য কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী।

সারণি ৫.৪৩ ঘরে সময় না দিয়ে বাইরে দিলে উপার্জন করতে না পারার কারণ		
উপার্জনের যোগ্যতা নেই	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সামাজিক ভাবেই সুযোগ নেই	২০	২০
আত্মসম্মানের ভয়	১৫	১৫
অন্যান্য	১৯	১৯

লেখচিত্র- নং: ৩৫

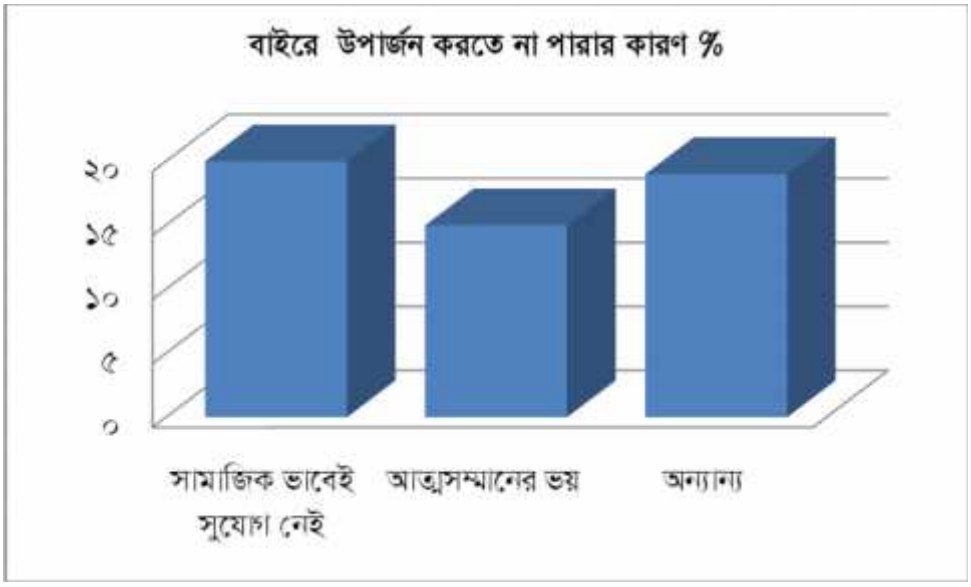

তবে উত্তরদাতা সদস্যদের মধ্যে কিছু সদস্য ঘরের বাইরে উপার্জন করতে পারতেন না বলে মতামত দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে ২০ শতাংশ সদস্য বলেছেন সামাজিক ভাবেই সুযোগ নেই। আত্মসম্মানের ভয়ের কথা বলেছেন ১৫ শতাংশ এবং অন্যান্য কারণ বলেছেন ১৯ শতাংশ। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কিছুটা ঘাটতি এখনও রয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাছাড়া প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলো তাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

সারণি ৫.৪৪ নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য এনজিওদের করণীয় (একাধিক উত্তর)

এনজিওদের জন্য করণীয়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার	৭৮	৭৮
সুদের হার কমানো দরকার	৮৯	৮৯
হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার	৪৫	৪৫
আইনি সহায়তা বৃদ্ধি করা দরকার	৩৩	৩৩
সচেতনতা মূলক কর্মকান্ড	৪৫	৪৫

লেখচিত্র- নং: ৩৬

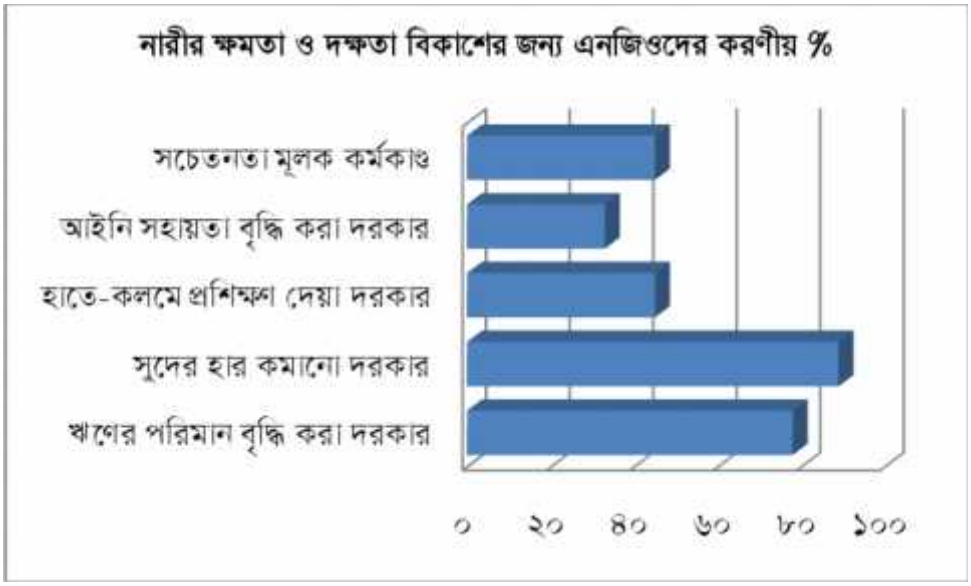

নারীর দক্ষতা ও ক্ষমতা বিকাশের জন্য এনজিওদের করণীয় সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায়, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন ৭৮ শতাংশ সদস্য। তবে দেখা যাচ্ছে সুদের হার কমানো কথা বলেছেন ৮৯ শতাংশ সদস্য। ৪৫ শতাংশ সদস্য বলেছেন বলেছেন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা। এছাড়া আইনি সহায়তা প্রদানের কথা বলেছেন ৩৩ শতাংশ সদস্য। সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের সুপারিশ করেছেন ৪৫ শতাংশ সদস্য। তবে দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমানোর ক্ষেত্রে নারীদের পরামর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া নারীদের সামাজিক উন্নয়নে আইনি সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ৫.৪৫ পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সুপারিশ

সুপারিশ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি	৭৬	৭৬
পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা	৫৩	৫৩
যৌতুক আইনকে কঠোর করা	৩৬	৩৬
ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করা	২৬	২৬
সন্তান পালনে অন্যান্যদের সহায়তা	৪৩	৪৩
নারীকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া	৩৫	৩৫
ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন	৩১	৩১
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি	৪৫	৪৫

নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য এনজিওরা কাজ করে যাচ্ছে, তারপরও নারীর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য এনজিও ও সমাজের অন্যান্য সংস্থাগুলো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে এ সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, মেয়েদের কাজের সুবিধা বাড়াতে হবে, পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা, যৌতুক আইনকে কঠোর করা, ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করা, সন্তান পালনে অন্যান্যদের সহায়তা, নারীকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো এসেছে। তথ্যে দেখা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলেছেন ৭৬ শতাংশ। পরিবারের সদস্যদের সচেতন করার কথা বলেছেন ৫৩ শতাংশ সদস্য। যৌতুক আইনকে কঠোর করার কথা বলেছেন ৩৬ শতাংশ সদস্য। ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলেছেন ২৬ শতাংশ। সন্তান পালনে অন্যান্যদের সহযোগিতার কথা বলেছেন ৪৩ শতাংশ, নারীর অধিকার সম্পর্কে নিজেকেই সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন, ৩৫ শতাংশ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা বলেছেন ৩১ শতাংশ সদস্য এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন ৪৫ শতাংশ। নারী উন্নয়নে এ সুপারিশগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত সারণিগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রমে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র ও ফলাফল ফুটে উঠেছে। মূলত এনজিওদের কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর সার্বিক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, উপকারভোগীদের মধ্যে দরিদ্র নারীর সংখ্যাই বেশি। এদের মধ্যে ১২ শতাংশের কোন জমিই নেই। তারা অন্যের জমিতে বা ভাড়া করে থাকে। তাছাড়া ৫৪ শতাংশের কোন কৃষি জমি নেই। শুধুমাত্র বাড়ির জমি রয়েছে। তাছাড়া যাদের কৃষি জমি আছে তাদের অধিকাংশেরই জমির পরিমাণ খুবই কম। অন্যদিকে একক পরিবারের সদস্যদের এনজিওতে অংশগ্রহণের

সংখ্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। একক পরিবারে বসবাসকারী নারী উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হয়। অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষার অবস্থার চিত্রে দেখা যায়, সদস্যদের তিনভাগের মধ্যে দু'ভাগেরও বেশি সদস্য নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত। সুবিধাভোগী নারীদের মধ্যে সব বয়সের নারীই রয়েছে। তবে অধিকাংশ সদস্যই মধ্য বয়সের। দেখা যায় বিবাহিত নারীদেরকেই ঋণ দেয়া হয় অর্থাৎ যাদের স্বামী বা সন্তান বা অন্য কোন পুরুষ সদস্য রয়েছে তাদেরকে ঋণ দেয়া হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে গৃহিণীর সংখ্যা বেশি। তবে তারা গৃহিণী হলেও ঘরে বসেই পরিবারের উন্নয়নে কাজ করছেন। তাছাড়া এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এনজিওরা নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রায় অর্ধেকের আয় গড়ে পাঁচ হাজারের নীচে। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় প্রায় অর্ধেক সদস্যের পরিবার দরিদ্র। তবে সংস্থার সদস্য হওয়ার পর প্রত্যেক সদস্যেরই আয় কম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৪ শতাংশ সদস্যের মাসিক আয় পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০ শতাংশ সদস্যের পরিবারে মাসিক আয় এক হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৩ শতাংশের পরিবারের দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ১৩ শতাংশ সদস্যের পরিবার তাদের আয় দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ৯ শতাংশ সদস্যের পরিবারে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ শতাংশ সদস্যের পরিবারে চার হাজার টাকা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪ শতাংশ সদস্যের পরিবারে চার হাজার টাকার উপরে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। দেখা গেছে ৪ বছর থেকে তার উপরের সদস্য সংখ্যা ৫৯ শতাংশ। এ দীর্ঘ সময় ধরে সংস্থার সাথে জড়িত থাকার ফলে তারা নিজেদের উন্নয়ন করতে পেরেছে। তাছাড়া দেখা গেছে ৫৬ শতাংশ সদস্য ঋণ তৃতীয়বার পর্যন্ত ঋণ নিয়েছে। তবে তৃতীয়বারে এমন অনেকে ঋণ নিয়েছেন যারা প্রথম ও দ্বিতীয়বারে ঋণ নিয়ে ভালো করতে পেরেছেন। তাছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বারে ঋণ গ্রহীতাদের অনেকেই আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও উন্নতি করতে পেরেছে। আয়ের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যে দেখা গেছে সংস্থার সদস্য ৭২ শতাংশের আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদের আয় বেড়েছে তারা সংস্থা থেকে টাকা তুলে উৎপাদনমূখী কোন কাজে বিনিয়োগ করতে পেরেছেন। দেখা যাচ্ছে আয় বর্ধক কাজে ঋণের টাকা বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া তারা আয় বর্ধক কাজ যেমন, ব্যবসা করা, অন্যান্য কাজের প্রশিক্ষণ পেয়ে ভালোভাবে কাজ করা, প্রচেষ্টার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং ঋণ পরিশোধ করে আবার ঋণ এনে নতুন ভাবে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। অর্থাৎ ঋণ এনে

যথাযথভাবে উৎপাদনমূখী খাতে তারা কাজে লাগিয়েছে এবং নিজেদের পূর্বের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থার সদস্যদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থান হয়েছে সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এনজিওগুলো চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা, মাতৃকল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা, দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি সুবিধা সমূহ দিয়ে থাকে। এনজিও প্রদত্ত এসব সুযোগ সুবিধা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এনজিওগুলো নারীদেরকে পরিবারের উন্নয়ন সহযোগী, অর্থ উপার্জনকারী, সচেতন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের মূল ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তৈরি করেছে। এনজিওদের কর্মসূচির প্রভাবে সদস্যরা আয় করতে পারছে, ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারছে, পরিবারকে স্বাবলম্বী করছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে সার্বিকভাবে সামাজিকভাবে প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্থার সদস্য হওয়ার পর উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের খাদ্যগ্রহণে পরিবর্তন এসেছে ৭২ শতাংশের। এনজিওতে অংশগ্রহণ করার ফলে নারীদের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ প্রবণতা কতটা বেড়েছে। পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসায় এখন সংসারের সকলকে গুরুত্ব দেয়া হয় অধিকাংশ পরিবারে। এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে নারীদের বাইরে বের হওয়ার হারও বেড়েছে। তারা এখন যেমন নিজেদের কাজে বাইরে যেতে পারে তেমনি সংগঠনের কাজে যোগ দেয়। কারণ নিজেদের উপর তাদের যেমন আস্থা বেড়েছে, তেমনি পরিবারও তাদের উপর ভরসা করছে। তাছাড়া সংস্থার কর্মীরা নারীদেরকে সহযোগিতা করে।

পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার বেড়েছে। যা একটা পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়ে যখন আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন, সে সিদ্ধান্ত পরিবারের জন্য সবচেয়ে ভাল ফল বয়ে আনে। এনজিও কার্যক্রমের প্রভাবে পরিবারে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় সন্তান গ্রহণে নারী পুরুষ উভয়ের সিদ্ধান্তের হার অনেক বেশি। সন্তান গ্রহণে নারীর মতামতে এ অগ্রগতির পেছনে এনজিওদের প্রভাব অনেক বেশি। পরিবারে নিজের আয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া শুধু ঋণ দিয়েই এনজিওরা দায়িত্ব শেষ করেনি, নারীর সার্বিক উন্নয়নে তারা অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। নারীদের সচেতন করতে তারা অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এনজিওরা উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে সচেতন করে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে নিরাপদ পানি ব্যবহারের হার অনেক বেড়েছে। সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব বেড়েছে সর্বাধিক হারে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারে আয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংস্থা কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের হার বেড়েছে। তাছাড়া সংস্থার কর্মীদের পরামর্শে পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যরা অনেকেই তাদের পরিবার ছোট রাখছে। সংস্থা উপকারভোগীদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। কেননা প্রশিক্ষণ ছাড়া দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয় আবার দক্ষতা ছাড়া আয় বর্ধক কর্মসূচিতে লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা যায় অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এনজিওরা বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারের নারীদের উন্নয়ন ও স্বাবলম্বিতার পথ দেখিয়েছে। এখানেই তাদের সফলতা অনেক।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা সার-সংক্ষেপ ও উপসংহার

৬.১ গবেষণার সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের শুরু থেকে এ পর্যন্ত নানা ধরনের কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। নারী উন্নয়ন বিষয়টি দেশের ছোট বড় সকল এনজিওর কাছে একটি আলোচিত প্রপঞ্চ। বর্তমান গবেষণায় তাই এনজিওদের কর্মকৌশলের প্রধান উপাদান নারীর উন্নয়ন তথা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের নারীরা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। নীচে গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল।

বাংলাদেশে এনজিওদের কাজের ইতিহাস অনেক দিনের। বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকে এনজিও এদেশের অবকাঠামো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে আসছে। সময়ের আবর্তে এনজিওরা আরও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত এনজিওদের কাজের ধরন পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম দিকে শুধু গ্রামে কাজ করলেও বর্তমানে এনজিওরা শহর গ্রাম উভয় জায়গাতে সমানভাবে কাজ করছে।

প্রথম দিকে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কাজ শুরু করে এনজিওরা। এছাড়া এনজিওরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দেয়। কোনো কোনো এনজিও নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়েই কাজ করে আরার কোনো কোনো এনজিও শুধু নারীদেরকে নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এনজিওরা তাদের কার্যক্রমকে গণমুখী করে তুলছে। তবে এনজিও কার্যক্রমে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন তথা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬.১.১ উপকারভোগী সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ

১. এনজিওর সাথে জড়িত উপকারভোগীদের বয়স সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য ৪৯ শতাংশ সদস্যের বয়স ২৬ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ১৫ থেকে ২৫ বছরের বয়সের সদস্য। সর্বনিম্ন সংখ্যক সদস্য অর্থাৎ ৭ শতাংশ সদস্যের বয়স ৪৬ থেকে

উপরের দিকে। ব্র্যাকের সুবিধাভোগী নারীদের মধ্যে সব বয়সের নারীই রয়েছে। তবে অধিকাংশ সদস্যই মধ্য বয়সের। অর্থাৎ কর্মক্ষম নারীদের হার বেশি।

২. দেখা যাচ্ছে, উত্তরদাতা সদস্যদের মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ সদস্যই একক পরিবারে বসবাস করে। যৌথ পরিবারে বাস করে ৩৭ শতাংশ। বর্তমানে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জীবিকার তাগিদে এখন মানুষ সনাতন যৌথ পরিবার প্রথা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

৩. উপকারভোগীদের শিক্ষাস্তর সম্পর্কিত তথ্যে দেখা গেছে, ব্র্যাকের ১২ শতাংশ সদস্য নিরক্ষর। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে ২৮ শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক ৩৯ শতাংশ। এস এস সি ১৫ শতাংশ এবং এইচ এস সি ৬ শতাংশ। তবে স্নাতক বা ডিগ্রি পর্যায়ের কোন সদস্য পরিলক্ষিত হয়নি।

৪. উপকারভোগীদের মধ্যে অবিবাহিত সদস্য একজনও নেই। তবে বিবাহিত অর্থাৎ স্বামী আছে এ ধরনের সদস্য ৮৩ শতাংশ। বিধবা সদস্য ১০ শতাংশ। তালাক প্রাপ্তা ৩ শতাংশ এবং স্বামী পরিত্যক্তা ৪ শতাংশ।

৫. পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাসে দেখা যায়, উপকারভোগীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ সদস্য গৃহিণী। তবে বিভিন্ন শ্রমের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ১৯ শতাংশ সদস্য। যারা বিভিন্ন শিল্পকারখানা, গার্মেন্টসে কাজ করে। এছাড়া ছোট খাট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ১০ শতাংশ। গৃহিণীদের অনেকেই তাদের স্বামী বা সন্তানের জন্য ঋণের টাকা উত্তোলন করেন বা সংসারের প্রয়োজনে ঋণ উত্তোলন করেন। তবে অনেকে নিজের প্রয়োজনেও এনজিওদের সাথে জড়িত।

৬. উপকারভোগীদের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় ব্র্যাকের শতকতা ৫৪ শতাংশ সদস্যের কোন কৃষি জমি নেই। ২ থেকে ৫ শতক জমি রয়েছে ২৯ শতাংশ সদস্যের। অর্থাৎ সদস্যদের তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি সদস্যের কৃষি জমি নেই বা খুব কম জমি রয়েছে।

৭. সুবিধাভোগী সদস্যদের শতকরা ১২ জনের কোন কোন জমিই নেই। পরের জায়গায় তারা থাকে। এছাড়া অর্ধেকেরও বেশি তথা ৫২ শতাংশ সদস্যের গৃহাঙ্গনের জমি রয়েছে ১ থেকে ৫ শতাংশ। ৬ থেকে ১০ শতাংশ জমি রয়েছে ১৭ ভাগের। এছাড়া ১২ শতাংশের ১১ থেকে ২০ শতাংশ এবং ৭ ভাগের ২১ শতাংশের উপর জমি বাড়ির জমি রয়েছে।

৮. উত্তরদাতা সুবিধাভোগীদের শত ভাগই প্রথমবার ঋণ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ২ হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে ৫৯ শতাংশ। ৪১ শতাংশ ৬ হাজার থেকে ১০ হাজারের

মধ্যে ঋণ নিয়েছে। প্রথমবারে ১১ হাজার বা তারও বেশি ঋণ নেয়নি কোন সুবিধাভোগী। দ্বিতীয়বার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে, সুবিধাভোগীদের ২৬ শতাংশ ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে। তবে ৪৯ শতাংশ সদস্য দ্বিতীয়বারে ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার ঋণ নিয়েছেন। এছাড়া ১৫ শতাংশ সুবিধাভোগী দ্বিতীয়বারে ১১ হাজার বা তার বেশি ঋণ নিয়েছে। অন্যদিকে ১০ শতাংশ সুবিধাভোগী দ্বিতীয়বারে ঋণ গ্রহণ করেননি। তৃতীয়বার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৫ শতাংশ সদস্য ২ থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ তুলেছেন। ২৪ শতাংশ সদস্য ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১৫ শতাংশ সদস্য নিয়েছেন ১১ হাজার টাকার উপরে।

৯. সংস্থার সদস্য ৭২ শতাংশের আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কমেছে ৬ শতাংশের এবং একই রকম আছে ২২ শতাংশের। উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনায় দেখা যায়, যাদের আয় বেড়েছে তারা সংস্থা থেকে টাকা তুলে উৎপাদনমূখী কোন কাজে বিনিয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু অনেকেই পরিবারের ঘাটতি মেটাতে, সন্তানের চাহিদা মেটাতে, স্বামীর প্রয়োজনে টাকা তুলেছেন এবং ব্যয় করেছেন।

১০. আয় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরে দেখা যায়, যাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তারা আয় বর্ধক কাজ যেমন, ব্যবসা করা, অন্যান্য কাজের প্রশিক্ষণ পেয়ে ভালোভাবে কাজ করা, প্রচেষ্টার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং ঋণ পরিশোধ করে আবার ঋণ এনে নতুন ভাবে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

১১. ৪ বছর থেকে ৬ বছর সংস্থার সাথে জড়িত সদস্যের সংখ্যা সর্বাধিক ৩৫ শতাংশ। এছাড়া ২ থেকে ৪ বছরের সদস্য ২৬ শতাংশ, ৬ থেকে ৮ বছরের সদস্য ১৫ শতাংশ, ৮ বছর বা তার উপরের সদস্য ৯ শতাংশ। তাছাড়া দুই বছর বা তার কম সময়ের সদস্য হওয়া সদস্য ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৪ বছর থেকে তার উপরের সদস্য সংখ্যা ৫৯ শতাংশ।

১২. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর সদস্যদের কর্মসংস্থান হয়েছে ২০ শতাংশের। তাছাড়া পরিবারের অন্যান্যদের কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৬ শতাংশের এবং সদস্য ও তার পরিবারের কর্মসংস্থান হয়েছে এমন সংখ্যা ১৬ শতাংশ। এবং কোন কর্মসংস্থান হয়নি এমন সংখ্যা ২৮ শতাংশ।

১৩. উপকারভোগী পরিবারের গড় মাসিক আয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা গেছে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতার পরিবারের গড় মাসিক আয় ৩ হাজার থেকে ৫ হাজারের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ৫ হাজার থেকে ৭ হাজারের মধ্যে ২৪ শতাংশ সদস্য। তবে ৩ হাজারের মধ্যে আয় করে এমন সদস্যও রয়েছে ১৬ শতাংশ। এছাড়া ৮ থেকে ১০ হাজার আয় করে এমন পরিবার ১৪ শতাংশ, ১০ থেকে ১২ হাজার আয় করে এমন পরিবার ১১ শতাংশ এবং ১২ হাজার টাকার উপরে আয়

করে এমন সদস্য ৯ শতাংশ। তবে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে ১ থেকে ৭ হাজার টাকা উপার্জনকারী পরিবারগুলো খুব দরিদ্র।

১৪. দেখা গেছে, প্রত্যেক সদস্যেরই আয় কম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে ২৪ শতাংশ সদস্যের মাসিক আয় পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০ শতাংশ সদস্যের পরিবারে মাসিক আয় এক হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৩ শতাংশের পরিবারের দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ১৩ শতাংশ সদস্যের পরিবার তাদের আয় দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ৯ শতাংশ সদস্যের পরিবারে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ শতাংশ সদস্যের পরিবারে চার হাজার টাকা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪ শতাংশ সদস্যের পরিবারে চার হাজার টাকার উপরে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫. এনজিও থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংস্থাগুলো চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা, মাতৃকল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা, দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি সুবিধা সমূহ দিয়ে থাকে। সংস্থাগুলো সদস্যদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ দানের পাশাপাশি এ সেবাগুলো দিয়ে থাকে। এনজিওগুলো নারীদেরকে পরিবারের উন্নয়ন সহযোগী, অর্থ উপার্জনকারী, সচেতন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের মূল ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তৈরি করেছে যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বড় ধরনের উদাহরণ।

১৬. এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে নারীর আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। ৬২ শতাংশ সদস্য বলেছেন তাদের পরিবর্তন এসেছে। তবে একই রকম আছে ৩৮ শতাংশ সদস্যের অবস্থান।

১৭. আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধরন সম্পর্কিত তথ্যে ৩৫ শতাংশ সদস্য বলেছেন, আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের গুরুত্ব বেড়েছে। ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারার কারণে আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্ব বেড়েছে ২৩ শতাংশ সদস্যের। ৩১ শতাংশ সদস্য পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়েছেন বিধায় তাদের গুরুত্ব বেড়েছে। সিদ্ধান্তে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫ শতাংশ সদস্যের। তাছাড়া সামাজিকভাবে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ শতাংশ সদস্যের।

১৮. উত্তরদাতারা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। ব্যবসা পরিচালনা, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু, মুরগি পালন বা বনায়ন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতনতা ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং দল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সদস্যরা।

১৯. প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগী নারীদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা নিজেরাই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছে, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারছে, সমাজে ও পরিবারে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, দক্ষতা অর্জন করার ফলে ঘরে বসেই অনেক কাজ করতে পারছে, স্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, দলীয় কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বুঝতে পারছে। ব্র্যাকের ১৯ শতাংশ সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়ে ব্যবসা করতে পারছে, ৫২ শতাংশ সদস্য নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারছে, ৪৩ শতাংশের পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘরে বসেই বিভিন্ন কাজ করে ৪৬ শতাংশ সদস্য তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারছে, ৪৬ শতাংশ সদস্য তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এছাড়া নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে ২৫ শতাংশ সদস্য, দল ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশ সদস্যের।

২০. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের খাদ্যগ্রহণে পরিবর্তন এসেছে ৭২ শতাংশের।

২১. ৭৬ শতাংশ সদস্যের পরিবার নিরাপদ পানি পান করে। বাকি ৫ শতাংশ নিরাপদ পানি পান করে না এবং ১৯ শতাংশ নিরাপদ পানি পানের ক্ষেত্রে অনিয়মিত।

২২. সংস্থার প্রভাব বা সংস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি গ্রহণে সচেতন হয়েছে ৩৫ শতাংশ। তাছাড়া রেডিও, টেলিভিশন বা গণমাধ্যমের প্রচার, প্রচারণায় সচেতন হয়েছে ৬৫ শতাংশ এবং অন্যান্যভাবে সচেতন হয়েছে ৫২ শতাংশ।

২৩. এনজিওতে অংশগ্রহণ করার ফলে শতকরা ৮৯ ভাগের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই রকম আছে ১১ শতাংশের।

২৪. চিকিৎসা প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উপকারভোগীদের সচেতনতা বেড়েছে, সংস্থার প্রভাব, মিডিয়ার প্রভাব, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়, সামর্থ্য বেড়েছে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কাছাকাছি হাসপাতাল আছে ইত্যাদি। সংস্থার প্রভাবে ৫৫ শতাংশ সদস্যের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ৬২ সদস্য মিডিয়া বা গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অর্থাৎ টেলিভিশন ও রেডিওর প্রভাবে তারা সচেতন হয়েছে।

২৫. পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসায় আগে নারীর তুলনায় পুরুষদের গুরুত্ব প্রদান করা হত। কিন্তু বর্তমানে এনজিওর সঙ্গে যুক্ত নারীদের এ চিত্র বদলেছে। ব্র্যাকের শতকরা ৬৫ শতাংশ সদস্যের পরিবারেই সবার জন্য চিকিৎসা সেবার সমান ব্যবস্থা করা হয়। তবে ২০ শতাংশ পরিবারে পুরুষকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ১৫ শতাংশ পরিবারে নারীকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

২৬. এনজিওর সাথে জড়িত নারীদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা পূর্বের তুলনায় ৬৩ শতাংশের বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৭. ৬৪ শতাংশ সদস্য তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পূর্বে তুলনায় আগ্রহী হয়েছেন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে। সংস্থা সচেতনতা মূলক কর্মসূচি, সংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রদান, শিক্ষার প্রতি সংস্থার গুরুত্ব প্রদান, সংস্থার স্কুল স্থাপন এ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২৯ শতাংশ সুবিধাভোগী তাদের সন্তানদেরকে সংস্থার স্কুলে পাঠান। ফলে দেখা যায়, সংস্থার মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে অধিকাংশ সুবিধাভোগী আগ্রহী হয়েছেন।

২৮. এনজিওগুলো সরকারের সহায়ক হিসেবে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার সদস্য হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে ৬২ শতাংশ সদস্য বা তার পরিবারে পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৯. পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থা থেকে বিভিন্ন ভাবে সচেতন হয়েছে ৩৫ শতাংশ সদস্য।

৩০. ৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা বাড়ির বাইরে যেতে পারছে। এতে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা নেই। এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে নারীরা অনেক স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। তারা ক্ষমতায়িত হচ্ছে।

৩১. নারীদের বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় সংস্থার সদস্য হওয়ার পর নিজেদের প্রতি আস্থা বেড়েছে ৪৬ শতাংশ সদস্যের। তাছাড়া সদস্যদের পরিবার তাদের প্রতি আস্থা পেয়েছে ৩০ শতাংশ পরিবারে। এছাড়া স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে সংস্থা ও সংস্থার সদস্যরা তাদেরকে সচেতন করে ২০ শতাংশ।

৩২. সমিতির সদস্য হওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে ৬৮ শতাংশের। সংস্থার সদস্য হওয়ার পর সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ৪৩ শতাংশ সদস্যের প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি কাজ করেছে। অর্থাৎ তারা পরিবারে অর্থের ব্যবস্থা, নতুন করে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পেরেছে বিধায় তাদের সিদ্ধান্তে তাদের ভূমিকা বেড়েছে। আবার সমিতির বিভিন্ন সভায় যোগদানের ফলে ৫৫ সদস্যের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্যরা আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, ফলে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৪. ৫৮ শতাংশ সদস্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তবে স্বামীর ইচ্ছা প্রাধান্য পায় এখনও ২৫ শতাংশ পরিবারে।

৩৫. আয় করতে পারা ৭৬ শতাংশ সদস্যের মধ্যে ২৮ শতাংশ সদস্য নিজের ইচ্ছায় তার অর্জিত টাকা খরচ করতে পারে। তবে ২১ শতাংশ সদস্যের স্বামী সদস্যের আয় খরচ করেন। তবে সংসারের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খরচ করে ১৯ শতাংশ সদস্যের পরিবারে।

৩৬. এনজিওর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে ৫৩ শতাংশ সদস্যের কাজের চাপ বেড়েছে। তবে ৪৭ শতাংশ সদস্য মনে করে তাদের কাজের চাপ পূর্বের তুলনায় বাড়েনি বরং একই অবস্থায় আছে।

৩৭. সংস্থার কাজে সময় দিতে হয় বিধায় কাজের চাপ বেড়েছে বলে মনে করেন ২০ শতাংশ। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অতিরিক্ত কোন কাজ করে না বিধায় ২৪ শতাংশ সদস্য মনে করে তাদের কাজের চাপ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৮. ৬৫ শতাংশ সদস্যের মতামত হচ্ছে নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তবে ৩৫ শতাংশ সদস্যের মন্তব্য হচ্ছে নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম আছে অর্থাৎ কোন পরিবর্তন হয়নি।

৩৯. দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে ৪৫ শতাংশ সদস্যের। বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ থেকে কোন বাধা নেই ৩৪ শতাংশের ক্ষেত্রে, সন্তান দেখাশোনার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সহযোগিতা করছে ৪৬ শতাংশ সদস্যকে, বাইরের কাজে ধর্মীয় বিধি নিষেধ তেমন নেই ৩৫ শতাংশের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ২৬ শতাংশের ক্ষেত্রে।

৪০. ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তার ঘরের কাজে যে সময় ব্যয় করেন তা বাইরে ব্যয় করলে উপার্জন করতে পারতেন।

৪১. নারীর দক্ষতা ও ক্ষমতা বিকাশের জন্য এনজিওদের করণীয় সম্পর্কে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন ৭৮ শতাংশ সদস্য। সুদের হার কমানো কথা বলেছেন ৮৯ শতাংশ সদস্য। ৪৫ শতাংশ সদস্য বলেছেন বলেছেন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা। আইনি সহায়তা প্রদানের কথা বলেছেন ৩৩ শতাংশ সদস্য। সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের সুপারিশ করেছেন ৪৫ শতাংশ সদস্য।

৪২. নারীর উন্নতির জন্য এনজিও ও সমাজের অন্যান্য সংস্থাগুলো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে এ সংক্রান্ত তথ্য দেখা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলেছেন ৭৬ শতাংশ। পরিবারের সদস্যদের সচেতন করার কথা বলেছেন ৫৩ শতাংশ সদস্য। যৌতুক আইনকে কঠোর করার কথা বলেছেন ৩৬ শতাংশ সদস্য। ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলেছেন ২৬ শতাংশ। সন্তান

পালনে অন্যান্যদের সহযোগিতার কথা বলেছেন ৪৩ শতাংশ, নারীর অধিকার সম্পর্কে নিজেকেই সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন, ৩৫ শতাংশ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা বলেছেন ৩১ শতাংশ সদস্য এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন ৪৫ শতাংশ।

৬.২ উপসংহার

বাংলাদেশে এনজিওদের নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা শিরোনাম "নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা"-এর মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রমের মধ্যে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়টি কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এনজিওরা দরিদ্র, বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের সাথে কাজ করে। শুরুতে দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক,সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থান খুব দুর্বল ছিল। নারীকে মানুষ বলে গণ্য করা হত না। এনজিওরা এই অবহেলিত শ্রেণিকে লক্ষ্য করে কার্যক্রম শুরু করে। তাদেরকে ঋণ প্রদান করে আয় বর্ধক কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে, ফলে নারী আজ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। কিন্তু অর্থোপার্জন নারীর জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়, যেমন-নারীর স্বাধীন উপার্জন স্বামী হস্তগত করতে চায়, নারী নিজের উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারে না ইত্যাদি অনেক সমস্যা। তবে নারীর উন্নয়নের প্রথম পরিকল্পনাই ভন্ডুল হয়ে পড়ে ঋণের টাকা দিয়ে নারী স্বাবলম্বী না হয়ে স্বামী. সন্তানের হাতে টাকা তুলে দেওয়ায়। এ ক্ষেত্রে এনজিও'র ঋণ মহিলাদেরকে স্বামী বা অন্যান্য সুফল ভোগী শ্রেণির মাধ্যম হিসাবে পরিণত করে। এ সত্ত্বেও বর্তমানে নারীরা যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে প্রান্তিক নারীদের যে সংগ্রাম, যে আশা, যে স্বপ্ন, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে এনজিওগুলো রোপণ করেছে। বর্তমান সদস্যরা এনজিও থেকে হাজার হাজার টাকা ঋণ নিচ্ছে এবং নিজেদের ব্যবসা বাড়িয়ে সংসারে স্বচ্ছলতা আনছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে নারী পরিবারে আর অবহেলিত নয় বরং মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে।

পরিবারে অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও কিছুটা করে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। প্রথম অবস্থায় এনজিওর সাথে জড়িত হলে ধর্মীয় ও সমাজের নেতারা একঘরে করে রাখতো এবং ঐ নারী ও তার পরিবারকে নানান রকম ফতোয়ার শিকার হতে হতো। এনজিওরা ওইসব ধর্মীয় নেতাদের বুঝানোর পাশাপাশি ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিয়েছে। এরপর আস্তে আস্তে সমাজের নেতারা বুঝতে পেরেছে এনজিও তাদের সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে। অর্থনৈতিক

স্বাবলম্বিতা সবসময় মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না, যদি তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো না যায়। এই উপলব্ধি থেকে এনজিওরা নারী এবং তার পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে উপকারভোগী নারী ও তার পরিবারের চিকিৎসা প্রবণতা বেড়েছে এবং তারা নারী-পুরুষ সকল সদস্যকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করায়। নারী সন্তান ধারণে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, পরিবারের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারছে, নিজের আয়ের টাকা নিজে খরচ করতে পারছে। নারী আস্তে আস্তে ক্ষমতায়িত হয়ে উঠছে।

অতএব বলা যায়, নারীদের আত্মবিশ্বাসের জায়গাটি সুদৃঢ় করতে এনজিওগুলো কাজ করছে। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তোবা তা পরিপূর্ণতা পায়নি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ ক্ষমতায়নে কোন প্রতিবন্ধকতাই ধোপে টিকবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদনঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৯৯

আখতার, বেগম হামিদা, পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে নারীর মানসিক সুস্থতাবোধ, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৩, ২০০০

আখতার, তাহমিনা, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

আখতার, রাশেদা, "উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও, গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন: একটি নৃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ১, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬

আরেফিন, মোঃ ছাদেকুল, *ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ব্র্যাক কার্যক্রমের অবদান* ,ঢাকা: এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৭

আহমদ, সালাউদ্দিন; সরকার, মোনায়েম; মঞ্জুর, নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯

ইউনূস, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশ ২০১০*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০০০

ইসমাইল, মোঃ হোসেন, "পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও এনজিও উদ্দোগ: একটি পর্যালোচনা", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৬, ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৪

ইসলাম, মোঃ রেজাউল, "লিংগ বৈষম্য: বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত", দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮

উদ্দিন, মোহাম্মদ কামাল, *গণতন্ত্রায়নে এনজিও*, ঢাকা: আরবান প্রকাশনা, ২০০০

খান, মোহাম্মদ শাহীন; আখতার, তাহমিনা, "নারী নির্যাতন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৫, ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৩

খাঁন, সালমা, "সিডও সনদ; দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংগ্রামের ফল", ঢাকা: অনন্যা, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ১৯৯৭

গালিব, এন. আই., "জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও", উন্নয়ন পদক্ষেপ', ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

চৌধুরী, এজাজুল হক, *মানবিক উন্নয়ন*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৯

জাহান, সেলিম, *অর্থনীতি ভাবনা ও ২০০০ সালের বাংলাদেশ*, ঢাকা: চেতনা প্রকাশনী, ১৯৮৯

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান ও জরিনা রহমান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৭

দুর্জয় নারী সংঘ, *বুলেটিন*, ২০০৫

পারভীন, নিলুফা, "দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর ভূমিকা", উন্নয়ন পদক্ষেপ, ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *সিডো*, ২০০০

মজুমদার, প্রতিমা পাল, "শ্রমজীবী মহিলাদের দারিদ্র্যের বিভিন্ন মাত্রা", *দরিদ্র ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, বিআইডিএস, ১৯৯৭

মজুমদার, শ্রী রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৬

মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

মোসতাফা, সুলতানা খানম, "বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন: মীথ এবং বাস্তবতা", *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা ৪, ঢাকা: উইমেন ফল উইমেন, ২০০২

মুহাম্মদ, আনু, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সংকট ও এনজিও মডেল*, ঢাকা: প্রচিন্তা প্রকাশনী, ১৯৮৮

রব, মুহাম্মদ আব্দুর, *বাংলাদেশের এনজিও: তৎপরতা বনাম অপ তৎপরতা*, ঢাকা: আইআরডি ও পিসিআরডি, ২০০৩

রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন*, ঢাকা: নিউ এড পাবলিকেশন্স, ২০০১

রহমান, শাহীন, *জেন্ডার প্রসঙ্গ*, ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮

রহমান, শাহীন, *দারিদ্র্য বিমোচন ঃ বাস্তবতা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৩য় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৯৯৭

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর, *সামাজিক ইতিহাস ও উন্নয়ন ভাবনা*, ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৯

সামাদ, মুহাম্মদ, "সমাজকল্যাণের ধারণার বিবর্তন", দি জার্নাল অব সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬

সামাদ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনে এনজিওর ভূমিকা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৩

সালাহউদ্দিন, খালেদা, *একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী* , ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৬

সুলতানা, আবেদা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ২, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮

সিদ্দিকী, কামাল, *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫

স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, "জাতিসংঘ এবং নারী উন্নয়ন", এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭

স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, "লোকাল এনজিও নেটওয়ার্ক টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি", জুলাই ১৯৯৮

হাশেমী, সৈয়দ, "এনজিওদের জবাবদিহীতা", ঢাকা: উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭

হাশেমী, সৈয়দ, "এনজিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো বিকল্প নয়" ঢাকা: *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৪০, মে, ১৯৯১

হোসেন, মোঃ আবুল; হোসেন, মোকাম্মেল, *উন্নয়ন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯

হোসেন, মোঃ ইসমাইল, *পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও এনজিও উদ্যোগ: একটি পর্যালোচনা*, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৬

হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২

ইংরেজি গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন

Afsana, Kaosar. *Women Program Organizar's Problems in BRAC: A Critical Assessment,* 1994

Ahmed, Dilruba. *Poverty Alleviation of the Hardcore Poor in Bangladesh: A Study on BRAC's Income Generation for Vulnerable Group Development Programme,* RED, BRAC, 1997

Ahmed, Mr. Salahuddin, and others, *The Role of NGO's*, Report of Task Forces of Bangladesh Devepoment Strategies for the 1990's, managing the Development Process, Vol 2, Dhaka: Dhaka University Press, 1991

Amin, Farzan D.; Hadi, Abdullahhel. *Microcradit Programs, Women Empowerment and Change in Nuptiality in Bangladesh Villages*, 1998

Alexander, K. C., "Dimensions and Indicators of Development", Journal of Rural Development, Vol 12 (3), India, 1993

ASA, *Annual Report*, 2003

ASA, *Annual Report*, 2005

Bangladesh Nari Progoti Sangha, *Annual Report*, Dhaka, 2004

Bangladesh Nari Progoti Sangha, *Gender Policy*, Dhaka, 2004

Bangladesh Nari Uddog Kendra, *Annual Report*, Dhaka, 2004

Bangladesh Women's Health Coalition, *Bulletin*, Dhaka, 2005

Bangladesh Women's Health Coalition, *Gender Training Manual*, Dhaka, 2004

Blood, Archer K., *The Cruel Birth of Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd., 2002

Batliwala, Srilatha. *The Maching of Women's Empowerment*, India: Women's World, 1995

Begum, Showkat Ara; Biswas, Tapos Kumar. *Women's Empowerment and Fertility*, Comilla: BARD,1998

Bilkis, Shahana. *Women Education, Employment and Empowerment: Analysis of Interrelationship*, 2004

Bose, Asish. *Women's Empowerment through Capacity Building*, Gonoprokashani, 2005

BRAC, *Annual Report*, Dhaka, 2004

BRAC, *Towards Gender Equity*, Dhaka: BRAC Printers, 1998

Chowdhury, D. Paul, *A Handbook of Socialwelfare*, New Delhi: Atmaram & Sons, 1981

Das, G., *History of Social Thought*, New Delhi: Education Publishers, 1994

Fedrico, V. D. V. Ronald Health.; Lexinton, Co.; *The Social Welfare Institiution*, 1984

Fink, Arther E.; Conover, Wilson Everett E.; Merrill, B.; *The Field of Social Work*, New York: Library of Congress Catalogue, Fourth Edition, 1964

Friedelander, Walter A.; Apte, Robert Z.; *Introduction of Social Welfare*, India: Practice-Hall of India, 1997

Grameen Bank, *Annual Report*, Dhaka, 2004

Grameen Bank, *Gender Training Manual*, Dhaka: Grameen Bank, 2000

Hasina, Bushra. *Empowering Urban Poor Women: The Role of Shakti Foundation*, 2005

Hossain, Md. Noor. *The Role of Forestry in Poverty Alleviation of Rural Women*, 2004

Huda, Khawja Shamsul. *The Role of NGO's in Bangladesh Development*, Bangladesh Development Dialogue Journal of SID Bangladesh Chapter, Dhaka, 1984

Huda, Shamiha. *Womens Control over Productive Assests: Role of Credit based Development Intervention*, 1998

Islam, Nurul. Making of a Nation Bangladesh, Dhaka: University Press Ltd., 2003

Kabir, M; Rahman, M.B. *Rural Poverty and Demographic change: Evidence from village based women in development programs (seminar paper) USSP*, Mexico, 1994

Kamal, Firoz Mahboob, *Impact of Credit-Plus Paradigm of Development of Gender Inequality, Women's Empowerment and Reproductive Behaviour in Rural Bangladesh,* 1998

Kamal, Masuda. *Empowerment of Rural women A study on OSDER, A NGO working in Munshigonj district*, 2003

Kohli, Shanti Chandra. "Women and Empowerment", Indian Journal of Public Administration, Vol-XLIII, No-3, July-September, 1997

Madan, G. R., *Indian Social Problems*, New Delhi, Vol 2, 1980

Mia, M.S. Alam., *Poverty Alleviation in Bangladesh, an Exploration*, Dhaka: Bangladesh Unnayan Parishad, 1993

Momsen, Janet Henshall, *Women and Development in the third world*, New York: Routledge, 1993

Morales, Armando; Sheafor, Baradford W.; *Social Work: A Profession of Many Facts*, New York: Library of Congress, Fourth Editon, 1986

Myrdal, Gunner. *Asian Drama: An Inquiry in to the poverty of Nations*, London: Allen Lane Penguine Press, 1972

Naz, Farzana, *Pathways to Womens Empowerment in Bangladesh*, Dhaka: AHDPH, 2006

PROSHIKA, *Annual Report*, Dhaka, 2004

PROSHIKA, *Gender Training Manual*, Dhaka: PROSHIKA, 2000

Rahman, AKM Motinur, *NGO and Development myth & Reality*, Dhaka: AHDPH, 2010

Rahman, Md. Habibur. *Participation of Women in Rural Development: An Experience of Comprehensive Village Development Programme,* Vol-6, Bangladesh Polli Unnayan Samikha, 1996

Rahman, Shafiqur; Singh, Lisa S. *Empowerment of Women in CIRDAP Member Countries: Experience and Issues*, CIRDAP, 2003

Salahuddin, Khaleda; Shamim, Ishrat. *Rural women in poverty-NGO Interventions for Alleviation,* Women for women, 1996

UNICEF, *UNICEF at a Glance*, New York: January 2004

Ullah, AKM Ahsan and Routray, K Jayant, *NGOS and development Alleviating Rural poverty in Bangladesh*, Dhaka: Book Mark international, 2003

Yunus, Muhammad. *Grameen Bank at a Glance*, Dhaka: Grameen Bank, 2004

White, Sara, *C. Arguing with the crocodile : Gender and class in Bangladesh*, Dhaka. University press limited, 1997

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সাক্ষাৎকার অনুসূচি-ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

"নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এন,জিওর ভূমিকা"

[অবগতি: সম্মানিত উত্তরদাতাবৃন্দ, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম. ফিল. (শেষ বর্ষের) ছাত্রী। এই বছর উপর্যুক্ত শিরোনামে আমার গবেষণা কাজ পরিচালনা করছি। আমার বিশ্বাস, এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতায় আপনি একজন তথ্য সরবরাহকারী। আপনার মূল্যবান তথ্যাবলি আমার গবেষণার উদ্দেশ্য সফল করে আমার শিক্ষা ক্ষেত্রকে অর্থবহ করতে সাহায্য করবে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার প্রদত্ত মূল্যবান তথ্যাবলি শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর গোপনীয়তা যথাযথভাবে রক্ষা করা হবে।]

অনুসূচি নং-

নিরীক্ষকের পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ: তথ্য সংগ্রহকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ:

এনজিওর উপকারভোগীদের জন্য

উত্তরদাতার পরিচিত ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি

১. উত্তরদাতার নাম-

২. গ্রাম/মহল্লা-

৩. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড-

৪. উপজেলা-

৫. জেলা-

৬. উত্তরদাতার বয়স-

৭. পরিবারের ধরন:

যৌথ পরিবার	
একক পরিবার	

৮. পরিবারের মোট সদস্য:

পরিবারের সদস্য	জন
পুরুষ	
নারী	
১২ বছরের নিচে	
৬০ বছরের উর্ধ্বে	

৯. উত্তরদাতার শিক্ষা:

শিক্ষাস্তর	
নিরক্ষর	
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত	
ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি	
এস এস সি	
এইচ এস সি	
স্নাতক	

১০. উপকারভোগীদের বৈবাহিক অবস্থা:

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা
অবিবাহিত	
বিবাহিত	
বিধবা	
তালাক প্রাপ্তা	
স্বামী পরিত্যক্তা	

১১. উপকারভোগীদের পেশা:

১২. উপকারভোগীদের কৃষি জমির পরিমাণ:

১৩. উপকারভোগীদের গৃহাঙ্গনের জমি:

১৪. কত বছর ধরে সংস্থার সাথে যুক্ত রয়েছেন?

১৫. সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা ঋণ পেয়েছেন?

প্রথমবার	দ্বিতীয়বার	তৃতীয়বার

১৬. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর আপনার আয়ে কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই রকম আছে	

১৭. আয়ের পরিবর্তন হলে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

ব্যবসা করতে পারা	
আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশল শেখা	
মূলধন বৃদ্ধি পাওয়া	
ঋণ শোধ করে আবার ঋণ আনা	

১৮. আয়ের পরিবর্তন না হলে কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

১৯. সদস্য হওয়ার পর আপনার কর্মসংস্থানে কোন ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

নিজের কর্মসংস্থান হয়েছে	
পরিবারের অন্য কারো কর্মসংস্থান	
নিজ ও অন্যান্যদের কর্মসংস্থান	
কর্মসংস্থান হয়নি	

২০. কর্মসংস্থানে কোন পরিবর্তন না হলে এর পেছনে কারণ কী?

২১. আপনার পরিবারে গড় মাসিক আয় কত?

২২. মাসিক আয় গড়ে কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে?

২৩. সংস্থা থেকে আর কি কি সুবিধা পান?

চিকিৎসা সেবা	
পরিবার-পরিকল্পনা সেবা	
মাতৃকল্যাণ ও শিশু পরিচর্যা	
বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	
শিশু শিক্ষার সুযোগ	

২৪. সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন হয়েছে কি?

হ্যাঁ	
একই রকম আছে	

২৫. সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

আয়ের কারণে গুরুত্ব বেড়েছে	
ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারছি	
পরিবারকে স্বাবলম্বী করছে	
সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বৃদ্ধি	
সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি	

২৬. আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন না হওয়ার পেছনে কারণ কী?

২৭. সংগঠন থেকে কি কি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

ব্যবসা পরিচালনা	
সেলাই, হস্তশিল্প	
গবাদি পশু পালন ও বনায়ন	
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতনতা, মাতৃস্বাস্থ্য	
নারী-পুরুষ সমতা	
দল ব্যবস্থাপনা	

২৮. প্রশিক্ষণের ফলে আপনার কি পরিবর্তন এসেছে?

নিজে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারা	
পরিবারে থেকেই আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করতে পারা	
নিজের ভাল মন্দ বোঝা	
নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সচেতনতা, মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	
নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	
দল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি	

২৯. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর আপনার পরিবারে খাদ্য গ্রহণে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই রকম আছে	

৩০. আপনারা নিরাপদ পানি পান করেন কি?

হ্যাঁ	
না	
মাঝে মাঝে	

৩১. নিরাপদ পানি ব্যবহারে সচেতনতা বেড়েছে কীভাবে?

সমিতি/সংস্থা থেকে	
টেলিভিশন/ রেডিও থেকে	
অন্যান্য	

৩২. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর চিকিৎসা গ্রহণ প্রবণতা কেমন?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই আছে	

৩৩. পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে?

সংস্থার প্রভাব	
মিডিয়ার প্রভাব	
বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়	
সামর্থ্য বেড়েছে	
সামাজিক সচেতনতা	
কাছাকাছি হাসপাতাল আছে	
অন্যান্য	

৩৪. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়?

পুরুষ	
নারী	
সবাইকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়	

৩৫. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা কেমন?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই আছে	

৩৬. ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে?

সংস্থার প্রভাব/ সংস্থা বিনামূল্যে বই দেয়	
কাছাকাছি প্রাইমারি স্কুল আছে	
সংস্থার স্কুল আছে	
সামাজিকভাবে শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েছে	

৩৭. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের অবস্থা কেমন?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই আছে	

৩৮. দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে?

সংস্থার কর্মীদের কাছ থেকে পদ্ধতির সুফল জানতে পারি	
রেডিও/টেলিভিশনের প্রচারণা	
স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করে পদ্ধতি গ্রহণ করি	
সরকারিভাবে বিনামূল্যে পাওয়া যায়	
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে	

৩৯. পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি না পেলে এর কারণ কী?

৪০. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর বাইরে যাওয়ার প্রবণতায় কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই রকম আছে	

৪১. সদস্য হওয়ার ফলে বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা বৃদ্ধির পেছনে কারণ কী?

নিজের প্রতি আস্থা বেড়েছে	
নিজের প্রতি পরিবারের আস্থা বেড়েছে	
স্বাবলম্বী হতে হলে বাইরে যেতে হবে	
সংস্থার কর্মীদের সহায়তা	
সামাজিক পরিবর্তন আসছে	
অন্যান্য	

৪২. সংস্থার সদস্য হওয়ার পর পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই রকম আছে	

৪৩. পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে, এর পেছনে কারণ কী?

ঋণ নেয়ার ফলে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে	
সমিতির বিভিন্ন সভায় যোগদানের ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি	
প্রশিক্ষণের ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	
আয় বেড়েছে	
সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন	

৪৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলে এর পেছনে কারণ কী?

৪০. সন্তান ধারণে কার প্রভাব বেশি কাজ করে?

স্বামীর	
উভয়ের	
শাশুড়ি/শ্বশুরের	
আল্লাহর দান	

৪১. আয়ের টাকা কার হাত দিয়ে খরচ হয়?

নিজেই খরচ করতে পারে	
স্বামী খরচ করে	
সংসারের প্রয়োজনে দু'জনেই খরচ করি	
শাশুড়ি/শ্বশুর/সন্তান খরচ করে	
আয় নেই	

৪২. সদস্য হওয়ার পর পরিবারে কাজের চাপের অবস্থা কেমন?

বেড়েছে	
কমেছে	
একই রকম আছে	

৪৩. কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে এর পেছনে কারণ কী?

ঘরে-বাইরে কাজ করতে হয়	
পরিবারের সদস্যরা অতিরিক্ত কোন কাজ করে না	
সংস্থার কাজে সময় দিতে হয়	
অন্যান্য	
একই রকম আছে	

৪৩. কাজের চাপ কমে থাকলে এর পেছনে কারণ কী?

৪৪. নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত হয়েছে বলে মনে করেন কী?

পরিবর্তন হয়েছে	
একই রকম আছে	

৪৫. নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে?

পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে	
বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না	
পরিবারের সদস্যরা বাচ্চার দেখাশোনা করে	
বাইরের কাজে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে	
অন্যান্য পরিবারেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে	

৪৬. নারীর প্রজনন ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে তার চিত্র কেমন?

পরিবারের সদস্যরা ঘরের কাজে সহযোগিতা করে না	
বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়	
পরিবারের সদস্যরা বাচ্চার দেখাশোনা করে না	
বাইরের কাজে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি	
নির্যাতনের শিকার হতে হয়	

৪৭. আপনি ঘরে সময় না দিয়ে বাইরে সময় দিলে উপার্জন করতে পারতেন কি?

হ্যাঁ	
না	

৪৮.বাইরে সময় না দিলে উপার্জনের ক্ষেত্র কি হতে পারত?

ব্যবসা করা	
শ্রমিক হিসেবে শ্রম দেয়া	
চাকুরি করা	

চাষাবাদ	
অন্যান্য কর্মসংস্থান	

৪৯. বাইরে সময় দিয়ে উপার্জন করা সম্ভব না হলে তার কারণ কী?

সামাজিক ভাবেই সুযোগ নেই	
আত্মসম্মানের ভয়	
অন্যান্য	

৫০. নারীর ক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য এনজিওদের করণীয় কী হতে পারে?

ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার	
সুদের হার কমানো দরকার	
হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার	
আইনি সহায়তা বৃদ্ধি করা দরকার	
সচেতনতা মূলক কর্মকান্ড বাড়ানো	

৫১. পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনে আপনার সুপারিশ কি?

কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি	
পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা	
যৌতুক আইনকে কঠোর করা	
ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করা	
সন্তান পালনে অন্যান্যদের সহায়তা	
নারীকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া	
ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন	
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি	

ধৈর্য্য সহকারে উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারিখ: সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সম সুযোগ ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সম অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পূনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

২. পটভূমি

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। তার এ আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত: শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী

তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জেঁকে বসে ও দীর্ঘ সময় সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। অবশ্য এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে

স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। যে সব মায়েদের পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষতঃ শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকুরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল: (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এছাড়াও, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্য পরিধি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল: (১) দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (২) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (৩) নারীকে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (৪) উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (৫) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা; এবং (৬) মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বৃত্তি প্রথা চালু করা যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় "দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল" নামে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত "গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির" কাজও শুরু হয়।

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা, হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন, দুঃস্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করণের প্রচেষ্টাকেই আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প-াটফরম ফর অ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।

৪. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্তর দশকের প্রথম ভাগ থেকেই তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্র“তিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি এই উদ্যোগের ফলে রচিত হয়। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫

পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ; স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী; অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার ; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন; গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

৪.১ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটের অধিবেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। একই সময় Optional Protocol on CEDAW-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৫. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদ আছে, "রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন"। ২৮(৩)-এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা

বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোন রূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শতের অধীন করা যাইবে না"। ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"। ২৯(১) এ রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে"। ২৯(২) এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কমের নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না"। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচি। নারীদের কৃষি, সেলাই, ব-ক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয় বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র National Strategy For Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II) তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব-ক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্র্য বান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার

পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দরিদ্র মা এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি) এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০

দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়ন শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Home Based Micro Enterprise গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Rural Non Farm Activities এর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয় কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই কৌশলপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। (সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত)